আটআনা-সংস্করণ কোহিনুর গ্রন্থাবলী নং ৮

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা

[বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের গতি নির্ণয় ও সমালোচনা]

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন
প্রণীত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৩২৮

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

কলিকাতা

৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এবং

১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণম্

উৎসর্গ পত্র

সৎসাহিত্যানুরাগী

প্রাণাধিক পুত্র

শ্রীমান্ সুরেন্দ্রমোহন সিংহের হস্তে অর্পণ করিলাম।

কৃষ্ণনগর ৩০শে ফাল্গুন
১৩২৮

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

পূর্ব্বাভাষ

গত ১৯১৯ সনের জুলাইমাসে আমি জলপাইগুড়ীতে গিয়া সুহৃদ্‌বর স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের একখানা পত্র পাই। তাহাতে লেখা ছিল, "সময় মত "সাহিত্যে"র জন্য কিছু পাঠাইবেন। বর্ত্তমান সাহিত্যে শ্লীলতার শ্রাদ্ধ হইতেছে। মাসিকপত্র ও প্রকাশিত উপন্যাস কবিতাদি উপলক্ষ করিয়া যদি সাহিত্যে নীতি ও ধর্ম্মের অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন করিয়া ছোট ছোট প্রবন্ধ লেখেন, তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। আপনি এই কার্য্যের সর্ব্বাংশে সুযোগ্য পাত্র। ইহাইত আপনার জীবনের ব্রত।" আমি স্বর্গীয় বন্ধুর এই উচ্চপ্রশংসার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইলেও, তাঁহার এই পত্র খানিই আমাকে এই প্রবন্ধটি লেখায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। পরে ইহা ১৩২৭ সালের "সাহিত্য" পত্রে "সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা" নামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধটি ছাপা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সুরেশচন্দ্র আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ প্রেরণা না পাইলে এই প্রবন্ধটি লেখা হইত কি না সন্দেহ। সেই জন্য তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সাহিত্যে প্রকাশিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর দীননাথ সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক

সহৃদয় বন্ধু আমাকে তাঁহাদের অভিমত জানাইয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহেই প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। সেজন্য আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। পরিশেষে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার সম্পাদক, প্রথিতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহোদয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে লেখেন, "আপনার সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা আমি বড়ই যত্নের সহিত পড়িয়া থাকি এবং আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমার ঐকমত্য আপনাকে জানাইয়াছিলাম, বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে। এখন আপনার প্রবন্ধটী শেষ হইয়া গিয়াছে—আশা করি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবেন—দেশের মঙ্গল হইবে। আমিও আপনার সঙ্গে এক-হৃদয়ে প্রার্থনা করি—"ভগবান্ আমাদিগকে সেই গৃহের সুখ সম্পত্তি পবিত্রতা রক্ষার সুবুদ্ধি প্রদান করুন।"" ক্ষিতীন্দ্র বাবুর এই অযাচিত কৃপায় আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। পরে তিনি অনুগ্রহ প্রকাশে এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনের ভার গ্রহণ করিয়া আমার মহোপকার সাধন করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে। তাঁহার লিখিত একটি ভূমিকা দ্বারা এই পুস্তকের শিরোভাগ অলঙ্কৃত হইল। এখন প্রার্থনা করি, ভগবান্ এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল করিয়া আমাদের সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করুন। ইতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ভূমিকা।

আজ কয়েক মাস হইল, এই গ্রন্থখানি যখন গ্রন্থকার ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে "সাহিত্যে" প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া যে আরাম ও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, একমাত্র পূতিগন্ধপূর্ণ গৃহে সহসা সুবিমল প্রভাতবায়ু প্রবেশ করিলে যে আরাম ও আনন্দ পাওয়া যায়, একমাত্র তাহারই সহিত উহার তুলনা হয়। তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটী আমার এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, লেখকের সহিত তখন আমার পরিচয় না থাকিলেও আমি উপযাচক হইয়া তাঁহার মতের সহিত আমার মত যে মোটের উপর সম্পূর্ণ এক এবং তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশে আমার যে খুবই আনন্দ হইয়াছে তাহাই তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। আমার আনন্দের একটী বিশেষ কারণ ছিল এই যে, আমি যে কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, সেই কার্য্যের ভার আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন দেখিলাম। যাহাই হউক, এই সূত্রে পত্রব্যবহারের ফলে আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু বিষয়ে গুরু এই গ্রন্থের একটী ভূমিকা লিখিবার ভার আমার ন্যায় রসবোধবর্জ্জিত ব্যক্তির হস্তে সন্ন্যস্ত হইয়াছে। তাই এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি যে, এই ভূমিকা লিখিবার জন্য

উপন্যাস সাহিত্যের যে পরিমাণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, সে পরিমাণ জ্ঞান আমার নাই।

ততটা জ্ঞান না থাকিলেও যখন অবসর পাওয়া গিয়াছে, তখন সংক্ষেপে গ্রন্থোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমারও দুইচারিটী বক্তব্য না বলিয়াই বা থাকি কি প্রকারে? পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আবারও বলিতেছি যে, এই গ্রন্থপ্রকাশের কারণে আমার খুবই আনন্দ হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রত্যেক দেশহিতৈষীরও ইহাতে নিশ্চয়ই আনন্দ হইবে। আজকালকার উপন্যাসসমূহে যে অশ্লীলতা ও অস্বাভাবিকতার একঘেঁয়ে স্রোত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই গ্রন্থ সেই স্রোত ফিরাইবার মুখে প্রথম খুঁটি বসাইল, ইহাই হইল আনন্দের কারণ। এই গ্রন্থের দ্বারা গ্রন্থকার দেশের একটী অভাব মোচন করিয়াছেন। এই সকল অশ্লীল উপন্যাস নানা কারণে অনেকেই পড়েন বটে; কিন্তু এই অশ্লীলতার ধারা এদেশে প্রবাহিত হইবার অল্পকালের মধ্যেই সৌভাগ্যক্রমে এদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অন্তরে পুত্রকন্যাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সেই আতঙ্কের কারণে তাঁহারা এই প্রকার উপন্যাস প্রকাশের বিরুদ্ধে আপত্তির জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন—অশ্লীলতাবিরোধী ভাব দেশের মধ্যে অন্তঃসলিলভাবে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। গ্রন্থকারই সর্ব্ব-প্রথম সেই অব্যক্ত ভাবকে গ্রন্থবদ্ধভাবে ব্যক্ত আকার প্রদান করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। হাকিমির হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ভিতরেও যে গ্রন্থকার এবিষয়ে

হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

মোটামুটি হিসাবে বলিতে পারি যে, গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য বিষয়ে তাঁহার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। আর্টের দোহাই দিয়াই হউক বা যাহারই দোহাই দিয়া হউক, কাম প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি ভগবৎবিধানে স্বভাবতই প্রবল এবং যে বৃত্তিগুলি প্রবলতর হইলে মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া মানুষকে পশুর সহিত একই স্তরে আনিয়া ফেলে, সেই সকল বৃত্তি প্রবলতর করা কোন সূত্রেই সঙ্গত হইতে পারে না। সাধু ব্যক্তিকে চোর বলিতে বলিতে সাধুও চোর হইয়া পড়ে এবং চোরকে সাধু বলিতে বলিতে চোরও সাধু হয়, এইরূপ একটী গভীর অর্থপূর্ণ প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ অনুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, মানুষের সম্মুখে মন্দভাবের অসৎবিষয়ের চিত্র ধরাই উচিত নয়, সাধুভাবের কল্যাণকর বিষয়েরই চিত্র প্রত্যেক মানবহিতৈষীর অঙ্কিত করা উচিত। বঙ্কিম বাবু তাঁহার বিষবৃক্ষে পরিণামে সাধুতার জয় দেখাইয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকার তাঁহাকে ন্যূনাধিক সমর্থন করিয়াছেন। পরিণামে সাধুতার জয় দেখাইলেও সমস্ত গ্রন্থ পাঠের ফলে মনের উপর যে অসাধুতার বিষবৃক্ষের একটা ছাপ পড়িয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাই এবিষয়ে পথপ্রদর্শনের জন্য আমরা তাঁহাকেই দোষী করিব।

বর্ত্তমানে অনেক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসলেখক যে বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষের চারা লইয়া সেগুলিকে সযত্নে লালন পালন করিয়া

পরিবর্দ্ধিত আকার দিয়াছেন, তাহা না মানিলে চলিবে না। মনস্তত্ত্বের নামে তাঁহারা এই সকল পূতিগন্ধপূর্ণ বিষবৃক্ষ গৃহে গৃহে রোপণ করিয়া কি যে অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, তাঁহারা নানা কারণে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই মনে হয়।

গ্রন্থকার বেশ দেখাইয়াছেন যে, এই আলোচ্য উপন্যাসগুলির অনেকগুলিতে কেবল অশ্লীলতা জাগিয়া নাই, অস্বাভাবিকতাও অতিমাত্রায় জাগ্রত। গ্রন্থের পরিসর অল্প বলিয়া গ্রন্থকার বিস্তৃত-ভাবে এই অস্বাভাবিকতা খুলিয়া দেখান নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। কিন্তু মনে হয় যে আর একটু খুলিয়া বলিলে ভাল হইত। তেরো বৎসরের বালিকার মুখে যে সমস্ত কথা বলানো হইয়াছে, সেরূপ কথা বাহির হওয়া একেবারেই অসম্ভব। দুদিনের আলাপে আগন্তুক ব্যক্তির মুখে ভদ্রমহিলাকে যেরূপ অভদ্র ভাষায় সম্বোধন করানো হইয়াছে, সেরূপ ভাষায় সম্বোধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। গ্রন্থকার আরও কয়েকটী বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছেন—এই ভূমিকাতে সকলগুলি আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে; আমরা কৌতূহলী পাঠককে সমস্ত গ্রন্থটী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকার সার্ব্বভৌমিক সত্যের ভিত্তিতে এই সকল উপন্যাসের অসারতা ও অনিষ্টকারিতা দেখাইয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

একটী বিষয়ে তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই। তিনি বাল্যবিবাহকে ঋষিপ্রবর্ত্তিত ও প্রেমরোগের অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ প্রভৃতির প্রতিষেধক বলিয়াছেন। বাল্যবিবাহ ঋষিপ্রবর্ত্তিত কি না, সেবিষয়ে সকলে একমত নহেন। দ্বিতীয়ত বাল্যবিবাহ যদি প্রেম-

রোগের প্রতিষেধক হইত, তবে যে সময়ে বাল্যবিবাহ খুবই প্রচলিত ছিল, সে সময়েও বৈষ্ণব কবিগণ পূর্ব্বরাগ, পরকীয়া-প্রেম, প্রভৃতির পূর্ণ সত্তা উপলব্ধি করিলেন কিরূপে? আবার সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে যৌবনবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও তাহাদের মধ্যে তো ঐ সকল ভাবের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

আমাদের মনে হয় যে, প্রেমরোগের প্রতিষেধক একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠা। আমরা যদি বাল্যকাল অবধি পুত্রকন্যাগণকে সঙ্গত উপায়ে যত্নপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের উপর দাঁড় করাইতে যত্নবান হই ও শিক্ষা দিই, তাহা হইলে দেখিব যে এক পুরুষের অন্তর্বর্ত্তী সময়েই প্রেমরোগ অন্তর্হিত হইবে এবং অশ্লীল ও অস্বাভাবিকতাপূর্ণ উপন্যাসপাঠে তাহাদের মতিই হইবে না। সুহৃদ্বর যতীন্দ্র বাবুর গ্রন্থ বর্ত্তমানে প্রকাশিত অধিকাংশ উপন্যাসের যথার্থ প্রকৃতি সর্ব্ব-সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া, আশা করি, দেশের লোককে নিজের মঙ্গলের জন্য না হইলেও অন্ততঃ পুত্রকন্যাগণের মঙ্গলের জন্য এই সকল উপন্যাস পাঠে বিরত করিবে এবং প্রাচীন ঋষিদের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্য এদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত করিবে।

সকল কল্যাণের আকর ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, তিনি গ্রন্থকারের সাধু উদ্দেশ্য সফল করুন।

৫।১ বি, বারাণসী ঘোষের
সেকেণ্ড লেন, যোড়াসাঁকো
কলিকাতা। ১২ই চৈত্র ১৩২৮

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন প্রণীত

অন্যান্য পুস্তক।

		মূল্য
১।	ধ্রুবতারা (উপন্যাস)	
	(৭ম সংস্করণ)	২৲
২।	অনুপমা (উপন্যাস)	
	(২য় সংস্করণ)	২৲
৩।	তোড়া (সরল সমাজ-চিত্র ও সমালোচনা)	
	(২য় সংস্করণ)	॥০
৪।	তপস্যা (জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার উপায় নিরূপণ)	॥০

বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ—সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস

৫। উড়িষ্যার চিত্র

(তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা।

(১)

মানবদেহের সুস্থতা প্রধানতঃ দুইটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—পুষ্টিকর আহার ও নির্ম্মল বায়ু। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রোগের বীজাণুসকল আমাদের আহার্য্য দ্রব্য, পানীয় জল বা পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুর মধ্য দিয়া আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া রোগোৎপাদন করে। কলেরার বীজ পানীয় জল ও দুগ্ধের মধ্য দিয়া প্রবেশ করে; ক্ষয়কাসের বীজাণু ধূলিধূমাচ্ছন্ন দূষিত বায়ুর মধ্যে বাস করে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের দেহে প্রবেশ করে। ম্যালেরিয়ার বাহন হইতেছে মশা, যাহা নিতান্ত অলক্ষিত-ভাবে তাহার শুঁড় দিয়া আমাদের রক্তের সহিত তাহার প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপন করে। আবার সংপ্রতি আর একটি রোগ আবিষ্কৃত হইয়াছে—যাহার নাম hookworm অর্থাৎ বক্রকৃমি। ইনি মাটীর মধ্যে বাস করেন, আর আমাদের পদতলের মধ্য দিয়া অন্ত্র-নালীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া পরিপাকশক্তির ব্যাঘাত জন্মান। এই বক্রকৃমিই নাকি বাঙ্গালীর নির্জ্জীবতার প্রধান কারণ।

যাহা হউক এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রোগের বীজাণু হইতে মনুষ্যদেহকে রক্ষা করা বর্ত্তমান সময়ে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রধান

অনুসন্ধিৎসার বিষয় হইয়াছে। প্লেগ, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি কতকগুলি রোগের প্রতিষেধক বীজ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি দ্বারা টীকা দিলে ঐ সকল রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সর্ব্বোপরি বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতা এবং নিৰ্ম্মল বিশুদ্ধ জলবায়ু-সেবনই সর্ব্বপ্রকার রোগের প্রতিষেধক বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাই শারীর স্বাস্থ্যবিধানের মূলমন্ত্র।

শরীরের ন্যায় আমাদের মনেরও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন। "A healthy mind in a healthy body"—সুস্থ শরীরে সুস্থ মন লইয়া বাস করা সাধারণতঃ মনুষ্যত্বের আদর্শ। শরীরের ন্যায় মনের স্বাস্থ্যও পুষ্টিকর আহার্য্য এবং বিশুদ্ধ আবহাওয়ার (atmosphere) উপর নির্ভর করে। মনের সেই আহার্য্য কি? না জ্ঞানের বস্তু; আর তাহার আবহাওয়া কি? না সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। আমরা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানের বস্তুসকল আহরণ করি, মন সেইগুলিকে আত্মসাৎ (assimilate) করিয়া লইয়া নিজের পুষ্টিসাধন করে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী সেই পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করে। জ্ঞানের বস্তু যেমন মনের আহার যোগাইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে, সেইরূপ বিশুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সৎসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমরা সর্ব্বদা ইচ্ছানুরূপ মানুষের সঙ্গলাভ করিতে পারি না। আবার আমরা যে সকল লোকের সংসর্গে

বাস করি, অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের নিকট নূতন কিছু শিক্ষালাভ করিবার থাকে না। আমাদের মন সর্ব্বদাই নূতনত্বের জন্য লালায়িত। সাহিত্য আমাদের সেই অভাব পূরণ করে। সৎসাহিত্য আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে একটা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের মন সুস্থ রাখে। আবার তেমনি অসৎ সাহিত্য একটা দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের নানাপ্রকার মানসিক ব্যাধির উৎপাদন করে। x

বঙ্কিম বাবু তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে। সেই সামঞ্জস্যের অভাব হইলেই মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়। সেই সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মনোবৃত্তি সকলের উপযুক্ত অনুশীলন (culture) আবশ্যক। আমাদের কতকগুলি মনোবৃত্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত সতেজ থাকে, আবার কতকগুলি স্বভাবতঃ নিস্তেজ থাকে। সাধারণতঃ আমাদের কাম ক্রোধাদি রজোগুণ-সমুদ্ভূত প্রবৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ প্রবল, আর দয়া ক্ষমা ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি সত্ত্বগুণ-সমুদ্ভূত প্রবৃত্তিগুলি ততদূর প্রবল নহে। সুতরাং মনোবৃত্তির অনুশীলনের অর্থ, যে সব কুপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবল, তাহাদিগের জোর কমাইয়া, সৎপ্রবৃত্তি সকলকে বর্দ্ধিত করা। তবে কোনো প্রবৃত্তিকেই সমূলে উৎপাটন করা অনুশীলনের অর্থ নহে, তাহা মনুষ্য শরীরে সম্ভবপরও নহে। এরূপ দেখা যায় অনেক সৎপ্রবৃত্তিও অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মানসিক ব্যাধির উৎপাদন করে—যেমন অত্যধিক দয়া দ্বারা কত দাতা

সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, যেমন সৎসাহিত্য আমাদের সুপ্রবৃত্তি অনুশীলনে সাহায্য করে সেইরূপ অসৎসাহিত্য কুপ্রবৃত্তির অত্যধিক উত্তেজনা দ্বারা মানসিক সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া মানসিক ব্যাধির উৎপাদন করে। এ বিষয়ে সমগ্র সাহিত্য-মধ্যে কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত অধিক।

মনোবিজ্ঞানে আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলিকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—জ্ঞানশক্তি (knowledge), অনুভব-শক্তি (feeling) আর ইচ্ছাশক্তি (willing)। জ্ঞানশক্তি বিবিধ তথ্য সংগ্রহ দ্বারা আমাদিগকে বাহ্জগতে বিচরণের জন্য বর্ত্তিকা-হস্তে পথ দেখাইয়া দেয়, অনুভবশক্তি সুখদুঃখাদির বোধ জন্মাইয়া আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত করে, আর ইচ্ছাশক্তি সেই সকল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য আমাদিগকে বিষয়াভিমুখে পরিচালিত করে। আমাদের জীবনরূপ বাষ্পীয় পোতের জ্ঞান হইতেছে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (compass), অনুভবশক্তি হইতেছে বাষ্প (steam-power), আর ইচ্ছাশক্তি হইতেছে পরিচালন-যন্ত্র (brake), সুতরাং আমাদের প্রবৃত্তিমার্গে পরিচালনের জন্য অনুভবশক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে।

যেমন দর্শন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি পরিপুষ্ট হয়, তেমনি কাব্যানুশীলন দ্বারা আমাদের অনুভবশক্তির বিকাশ হয়। যে কারণে মানবমনে অনুভবপ্রবৃত্তির প্রাধান্য, সেই কারণে সাহিত্যজগতে কাব্যের স্থানও অতি উচ্চে। সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যের মধ্যে কাব্যই আমাদের সুপ্রবৃত্তির অনুশীলনে ও কুপ্রবৃত্তিদমনে

সাহায্য করিতে পারে। আমরা কাব্যের সৃষ্ট নরনারীর সঙ্গলাভ করিয়া জীবনের নূতনত্বের পিপাসা মিটাইতে পারি। সুতরাং আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যবিধানে কাব্যের মূল্য অত্যন্ত অধিক।

(২)

কাব্য কাহাকে বলে? কাব্যের একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা কঠিন। আমাদের সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ রসাত্মক বাক্যকে কাব্য নাম দিয়াছেন। কাব্য আমাদের মনে হর্ষবিষাদাদি রস (feeling) এর উদ্রেক করে। কবি তাঁহার ইন্দ্রজালপ্রভাবে কতকগুলি কল্পিত নরনারীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সাহায্যে আমাদের মনে রসোৎপাদন করেন। কবি তাহাদের জীবনের সাহায্যে আমাদের নিজের জীবনের ব্যাখ্যা করেন। এইজন্য একজন বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক কাব্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন "Interpretation of life" অর্থাৎ মানবজীবনের ব্যাখ্যা। কবি যে কৌশলে সেই ইন্দ্রজাল রচনা করেন, মিথ্যাকে সত্যের আকারে পরিণত করিয়া আমাদের মোহ উৎপাদন করেন তাহাকে আর্ট (art) বলে। এই আর্ট হইতেছে কাব্যের প্রাণ, তাহার মূলবস্তু। কিন্তু আর্ট কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কথিত আছে একজন বিখ্যাত চিত্রকর বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র আঁকিতেছিলেন। একজন চাষা তাহা দেখিয়া বলিল "আপনি এই জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন কেন? ফটোগ্রাফের দ্বারা

ত এক মুহূর্ত্তেই এই জায়গার ছবি তুলিতে পারেন।” বলা বাহুল্য সেই চাষা আর্ট কি তাহা বুঝিতে পারে নাই। কোন বস্তু বা ব্যক্তির ফটোগ্রাফ তোলাই আর্ট নহে, সেই বস্তু বা ব্যক্তির ছবির সঙ্গে আর্টিষ্টের নিজের হৃদয়ের ছাপও উঠা চাই। যিনি তাহা পারেন, তিনিই প্রকৃত আর্টিষ্ট, প্রকৃত কবি,—কারণ তাঁহার চিত্রে interpretation of life দেখিতে পাওয়া যায়। Lifeএর interpretation দিতে হইলে হুবহু স্বভাবের নকল করিলে চলে না, তাহার মধ্যে যে-টুকু সুন্দর, যে-টুকু সহজে ধরা পড়ে তাহা বাছিয়া বাহির করিতে হয়। আবার যে ভাব কবি অন্যের মনে প্রতিফলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাঁহার নিজের মনে যথার্থরূপে অনুভব করা চাই। বর্ত্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ মনীষী কাউণ্ট টলষ্টয় (Count Tolstoy) তাঁহার “What is art ?” নামক গ্রন্থে আর্ট সম্বন্ধে অনেক প্রকার গবেষণা করিয়া তাহার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

“Art is a human activity in this that one man consciously or unconsciously by means of certain external signs, hands on to others feelings he has lived through and that other people are infected by those feelings and also experience them.”

অর্থাৎ একজনের মনে যে অনুভূতির উদ্রেক হয়, তাহা যদি তিনি কোন বাহ্যিক উপায়ে অন্যের মনে সংক্রামিত করিতে

পারেন তবে তাহাই আর্ট। আর্টের এই লক্ষণ হইতে আমরা পাইতেছি—

(১) আর্টের মূলবস্তু অনুভূতির বিষয়, it is a feeling.

(২) তাহা কবি নিজে প্রথমে অনুভব করিবেন, তাঁহার মধ্যে sincerity চাই—কেবল শোনা কথা বা পড়া কথা লিখিলে আর্ট হয় না।

(৩) কবি তাহা কোন বাহ্যিক উপায়ে প্রকাশ করিয়া অপরের মনে সংক্রামিত করিয়া দিবেন।

(৪) তাহা কবির দেখাদেখি অন্যেও অনুভব করিতে পারিবে।

যে শিল্পবস্তুর মধ্যে এই কয়টি লক্ষণ বিদ্যমান তাহা কাব্য হউক, চিত্র হউক বা প্রতিমূর্ত্তি হউক তাহাই work of art.

ইহার সঙ্গে আর্টের আরও লক্ষণ পাইতেছি—"Art is a means of union among men, joining them together in the same feeling"—অর্থাৎ আর্টের দ্বারা মানবহৃদয়ের একতা সম্পাদিত হয়—অর্থাৎ কবির হৃদয়ের সহিত তাঁহার পাঠকবর্গের এবং পাঠকবর্গের মধ্যে পরস্পরের মনে একই প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়। "A work of art that united everyone with the author and with one another would be perfect art." কিন্তু সেই আর্টের বস্তু কিরূপ হওয়া উচিত? "Art unites men. Surely it is desirable that the feelings in which it unites them should be 'the

best and highest to which men have risen', or at least should not run contrary to our perception of what makes for the well-being of ourselves and of others. And our perception of what makes for the well-being of ourselves and others is what is called our religious perception."

অর্থাৎ যে সকল অনুভূতি দ্বারা মানবহৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম ভাবের বিকাশ হইয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে তাহাই আর্টের বিষয় হওয়া উচিত।* Tolstoy এর মতে "art is a human activity, and consequently does not exist for its own sake, but is valuable or objectionable as it is serviceable or harmful to mankind. অথাৎ আর্ট কেবল আর্টের জন্য নহে—যে পরিমাণে ইহা দ্বারা মানবসমাজের উপকার বা অপকার সাধিত হয় সেই পরিমাণে ইহা ভাল অথবা মন্দ।

যাঁহাদের মতে আর্ট কেবল আর্টের জন্যই মূল্যবান, সমাজের উপকারিতার বা অপকারিতার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই—কবির উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও আনন্দদান, স্কুলমাষ্টারি করা কবির কার্য্য নহে—তাঁহারা Tolstoy এর এই মত অবশ্য স্বীকার করিবেন না। কিন্তু আমাদের হিন্দুর দেশে, বসিষ্ঠ-

---

* আমাদের দেশের আলঙ্কারিকগণ "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর" বলিয়া কাব্যরসের একটা লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিশ্বামিত্র, ব্যাস-বাল্মীকি প্রভৃতি সিদ্ধমহর্ষিশাসিত সমাজে, চির-দিনই শিল্পকলা অন্যান্য মানবপ্রচেষ্টার (human activity) ন্যায় সমাজসেবায় নিযুক্ত থাকিবে। Count Tolstoy যে "religious perception"এর উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অর্থও সমাজসেবা।

"The religious perception of our time, in its widest and most practical application, is the consciousness that our well-being both material and spiritual, individual and collective, temporal and eternal, lies in the growth of brotherhood among men in their loving harmony with one another." অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মভাব কি? না মানুষে-মানুষে প্রীতি-স্থাপন ও ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। তাহার দ্বারাই মানবসমাজের কল্যাণ সাধিত হয়।

যাহা হউক লোকশিক্ষা ও সমাজের উন্নতিসাধনই যদি আর্টের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাদের বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গলা কাব্য দ্বারা সে উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সাধিত হইতেছে, এখন তাহার বিচার করিব। সকলেই জানেন কাব্য সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ নাটক, পদ্যকাব্য এবং গদ্যকাব্য যেমন উপন্যাস ও গল্প। ইহার মধ্যে উপন্যাস ও গল্প এই যুগে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উপন্যাস ও গল্পই এখন সর্ব্বজনপ্রিয় কাব্য। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এই শ্রেণীর কাব্যে আমরা নব নব নরনারীর সঙ্গলাভ করিতে পারি এবং তাহাদের আচরণ

দেখিয়া সহজেই আমোদ পাই। আর উপন্যাসে জীবনের ব্যাখ্যা অতি সুস্পষ্ট।

(৩)

বসন্তের মলয়হিল্লোল বহিলে যেমন বনস্থলী পর্য্যাপ্ত-পুষ্প-পল্লবে শোভিত হইয়া উঠে, বড়ই সুখের বিষয় বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য ও বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে, আমাদের বঙ্গসাহিত্যে অসংখ্য কাব্য নাটক নবেলের উৎপত্তি হইয়াছে। বসন্তকালে বনস্থলীতে যতগুলি পত্র-পুষ্প গজাইয়া উঠে তাহার সবগুলিই যেমন স্থায়ী হয় না, অথবা স্থায়ী ফল প্রসব করে না, সেইরূপ এই সব কাব্য নাটক নবেলের সবগুলিই যে স্থায়ী হইয়াছে বা হইবে এরূপ আশা করা যায় না। বরং দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের অনেকগুলিই অকালে ঝরিয়া পড়িয়া বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ সেগুলিতে প্রকৃত আর্টের অভাব। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে কবি হইয়াছেন ও হইতেছেন অনেক, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত আর্টের অধিকারী কয়জন? প্রকৃত আর্ট থাকুক বা না থাকুক, আজকাল দেখিতে পাই অনেক বাঙ্গালী লেখকেরই নবেল রচনার দিকে একটা মস্ত ঝোঁক পড়িয়াছে। কবিতার ন্যায় চৌদ্দ অক্ষর মিলাইতে হয় না বলিয়া অনেকে মনে করেন নবেল লেখা খুব সহজ। আবার পাঠকপাঠিকাগণও অতি সহজে, এমন কি ঘুমাইতে ঘুমাইতে নবেল পড়িতে পারেন। তাহার ফলে আজকাল প্রতি মাসে বিস্তর

নবেল ও গল্পের বই প্রকাশিত হইয়া মাসিকপত্রিকাসকলের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভগুলিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। যদি কেবল মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনস্তম্ভে সেগুলি নিবদ্ধ থাকিত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু, তাহাদের অধিকাংশ নবেল ও গল্পের বই আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেখানে যে একটা অস্বাস্থ্যকর আব্‌হাওয়ার (unhealthy atmosphere-এর) সৃষ্টি করিতেছে——আমাদের সমাজের বায়ু দূষিত করিতেছে, ইহাই আমাদের প্রধান আপত্তির কারণ। যে সকল লেখকের আর্ট নাই, তাঁহাদের গ্রন্থ তত অনিষ্টকর নহে, কারণ তাহা কেবল একটা ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াই লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁহারা প্রকৃত কবি ও আর্টিষ্ট তাঁহাদিগের গ্রন্থই বেশী অনিষ্টকর—কারণ তাঁহারা পাঠকপাঠিকার মনে একটা অস্বাস্থ্যকর ভাব চিরস্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে সকল মহাত্মা প্রকৃত ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী তাঁহারা art for art's sake এই ধুয়া ধরিয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

এস্থলে কেহ হয় ত বলিবেন, যাঁহারা নাটক নবেল পড়েন, তাঁহারা সেগুলিকে গল্প বলিয়া মনে করেন, ও তাহার দ্বারা সাময়িক আমোদ উপভোগ করেন মাত্র। তাহা তাঁহাদের জীবনে কার্য্যে পরিণত করিবেন এরূপ পাগল সংসারে কয়জন আছেন?

এরূপ পাগল যে একেবারেই নাই একথা বলা যায় না। এ সম্বন্ধে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রমাণ। তাঁহার "চোখের

বালি”র নায়িকা বিনোদিনীর সহিত বেহারীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ঃ——

বিহারী কহিল—“তুমি অনেক স্পষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছ, এবার আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি। তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে এবং কথাগুলি বলিতেছ ইহার অধিকাংশই তুমি যে সাহিত্য পড়িয়াছ, তাহা হইতে চুরি।” ইহার বারো আনাই নাটক নবেল।”

বিনোদিনী—“নাটক! নবেল!”

বিহারী—“হাঁ, নাটক, নবেল! সেও খুব উচ্চদরের নয়। তুমি মনে করিতেছ এ সমস্ত তোমার নিজের, তাহা নহে। এ সবই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ মূর্খ সরলা বালিকা হইতে, তাহা হইলেও তুমি সংসারের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে না——কিন্তু নাটকের নায়িকা ষ্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না।”

নাটক নবেল পড়িয়া কোন কোন গৃহস্থের কুলবধূ যে ষ্টেজের নায়িকা হইতে পারেন ইহা কেবল রবীন্দ্রনাথের কল্পনা নহে। কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনও “আমার জীবন” গ্রন্থে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি রাণাঘাট থাকিবার সময়ে একজন স্ত্রীলোক “কুন্দনন্দিনী” নাম স্বাক্ষর করিয়া ও বিষ খাইয়া মরিবেন এরূপ ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে প্রেমপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার “জ্যোৎস্না” নবেলের নায়িকা ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? “কুন্দনন্দিনীর” সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও ঘরে ঘরে অনেক কুন্দনন্দিনী শৈবলিনীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের কেহ কেহ

হৃদরোগে উদ্বন্ধনে বিষপানে আকালে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন—একথা পূজনীয় শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রও নাকি শেষ বয়সে অনুতাপ করিয়াছিলেন।*

নাটক নবেলে বর্ণিত প্রেমের চিত্র অপরিণত-বয়স্ক ও অগঠিত-চরিত্র বালকবালিকাদিগের মধ্যে যে কতটা হলাহল ছড়াইতে পারে, ইহা দ্বারা তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। আমার বোধ হয় কলেরা প্লেগ বসন্তের বীজ অপেক্ষাও এই প্রেমের বীজ সমাজ-শরীরে অধিকতর মারাত্মক।

"প্রেমের বীজ" বলিলাম, শুনিয়া কেহ হাসিবেন না। পাশ্চাত্য দেশের কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগের বীজের (germ) ন্যায় প্রেমেরও (love) একটা germ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রেমিক ও প্রেমিকার শরীরে নাকি সেই germ কোন সূত্রে প্রবেশ করিলে, তাহাদিগকে পাগল করিয়া তোলে। তবে প্লেগ বসন্ত কলেরার germ অতি শীঘ্রই কার্য্যকরী হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে শরীর ধ্বংস করে, আর এই love এর germ অলক্ষিতভাবে শরীরে অথবা মনে প্রবেশ লাভ করিয়া অতি ধীরে মানুষকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে। এই কারণে আমার মতে hookworm এর সহিত এই germ এর অধিকতর সাদৃশ্য আছে। আজকাল hookworm সম্বন্ধে গবেষণা

* ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, "কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিরুদ্ধ তাহা আমি স্বীকার করি।"—বঙ্কিমপ্রসঙ্গ—১৭৯ পৃষ্ঠা।

চলিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের germ এর গবেষণা করিলে মন্দ হয় না। তবে আমাদের ঋষিগণ বসন্তের টীকার ন্যায় এই প্রেমরোগের প্রতিষেধক একটা টীকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার নাম বাল্যবিবাহ। কিন্তু তাহাতে উপন্যাসলেখকের বড়ই মুস্কিল।

বোধ হয় সকলেই জানেন, যেমন কানু ছাড়া কীর্ত্তন হয় না, সেইরূপ প্রেম না হইলে উপন্যাস হয় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংপ্রতি "প্রেমের কথা" নামক যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। প্রেম না হইলে উপন্যাস হয় না বলিয়া উপন্যাস-লেখকের পক্ষে ইহা নিতান্ত সাংঘাতিক কথা। যে ইয়ুরোপীয় সমাজে উপন্যাস এত প্রসার লাভ করিয়াছে, সেখানে ঔপন্যাসিক প্রেমের কিছুমাত্র অভাব নাই, কারণ সে সমাজে বাল্যবিবাহ নাই, পূর্ব্বরাগের পরে বিবাহ হয়, আবার স্ত্রীস্বাধীনতা থাকাতে বিবাহের পূর্ব্বে এবং পরে স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলামেশার নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু বাঙ্গালী সমাজে ইহার একান্ত অভাব। এই কারণে বাঙ্গালী উপন্যাসলেখককে প্রেমের প্লট গঠন করিবার জন্য অনেক মাথা ঘামাইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে যুদ্ধবিগ্রহও নাই, যে কারণে সমাজে একটা উলট-পালট হইতে পারে, এবং রাজপুত্র যুবক জগৎসিংহ মুসলমান নবাবের অন্তঃপুরে বন্দী, হইলে সেখানে নবাবপুত্রী আয়েষা তাঁহাকে "বন্দী আমার প্রাণেশ্বর" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে। আবার বঙ্গদেশের ব্রাহ্মসমাজের কিয়দংশ যদিও ইংরাজ সমাজের অনুকরণে গঠিত

হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইচ্ছা করিলে নায়ক নায়িকা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, কিন্তু বাধ্য হইয়া প্লটের খাতিরে মন্দ কিছু লিখিলে চোখ-রাঙানির ভয় আছে,—এই দীন লেখক "ধ্রুবতারা" লিখিয়া সেইরূপ চোখ-রাঙানি যে না পাইয়াছেন এরূপ নহে। এমন কি কবিবর রবীন্দ্রনাথও "গোরা" লিখিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া বাঙ্গালী উপন্যাস-লেখককে হিন্দুসমাজের মধ্য হইতে অন্য প্রকার প্রেমের কল্পনা করিতে হয়। সেই প্রেম সাধারণতঃ তিন মূর্ত্তি ধারণ করে যথা—(১) বিধবার প্রেম, (২) সধবার প্রেম এবং (৩) বারবনিতার প্রেম।

(৪)

বিধবার প্রেম।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বিধবার প্রেমে পড়ার চিত্র কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন কবিগণ ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে চিরদিন সম্মানের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। রামায়ণে বালির স্ত্রী তারা বা রাবণ-বনিতা মন্দোদরীর তৎকালে প্রচলিত সেই সেই সমাজের প্রথা অনুসারেই পুনর্ব্বার দেবরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কাহারও প্রেমে পড়েন নাই। আমাদের আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই কুন্দনন্দিনীর সৃষ্টি করিয়া ইহার পথ দেখাইয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পরে রোহিণীও তাঁহার সৃষ্টি। কিন্তু কুন্দফুল সূর্য্যমুখীর পাশে অতি নিভৃতে, নিতান্ত জড়সড় হইয়া ফুটিয়াছিল, ফুটিতে ফুটিতে অকালে শুকাইয়া

গেল। কবি তাহাকে নায়িকার পদে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে খুব বড় করিয়া ধরেন নাই। রোহিণী বিধবা হইলেও কোকিলের কুহুরবে মাতোয়ারা হইবার বীজ তাহার রক্তের মধ্যে ছিল। সে যখন গৃহে ছিল, তখন তাহাকে বিধবা বলিয়া চেনা কঠিন হইত। সে গৃহত্যাগ করিয়া বারবিলাসিনীর গ্রেডে প্রমোশন পাইল। আর সে সধবা থাকিলেও যে গৃহত্যাগ করিত না, এ কথা হলপ করিয়া বলা যায় না। কবির মানসো-দ্যানের নীলোৎপল ভ্রমরের পার্শ্বে রোহিণী যেন উজ্জ্বলবর্ণ, গন্ধহীন বিলাতী ফুল—তাহার দ্বারা টেবল সাজানো চলে, কিন্তু তাহা দেবপূজায় লাগে না। ফল কথা, কুন্দনন্দিনী বা রোহিণীকে কবি নায়িকার আসন দেন নাই, বরং তাহাদের শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া তিনি সমাজের উপকারসাধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমরা পাইয়াছি কবিবর রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট বিধবা চরিত্র—'চোখের বালি'র বিনোদিনী। বিনোদিনী মৃদুগন্ধ, ক্ষুদ্রাবয়ব কুন্দফুল নহে, আবার বিলাতী মরসুমী ফুলও নহে একেবারে—সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপ। কবিবর বিনোদিনী-চরিত্রে তাঁহার আর্টের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। তবে গোলাপও বিদেশী ফুল,—এই গোলাপও শিবপূজায় লাগে না। কবি প্রথমেই বিনোদিনীর পরিচয় দিতে বসিয়া বলিয়াছেন—

'বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিসনারী মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য্য শিখাইয়াছিল।'

হিন্দুর ঘরের মেয়ে মিশনরি মেমের শিক্ষায় কিরূপ জীবে পরিণত হইতে পারে, আমরা বিনোদিনী-চরিত্রে তাহা পাইতেছি। বিনোদিনীর সহিত প্রথমে মহেন্দ্র নামক এক ধনী যুবকের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। পরে মহেন্দ্রের মাতা তাঁহার এক গ্রামসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত এই গরিবের মেয়েটির বিবাহ দেওয়াইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিনোদিনী তাহার অল্প কাল পরেই বিধবা হইল। এদিকে মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মহেন্দ্রও আশা নাম্নী একটী ক-অক্ষর-জ্ঞানহীনা, সম্পূর্ণ-সংসারানভিজ্ঞা বালিকাকে বিবাহ করিল। মহেন্দ্রের অনুরোধে প্রথমে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিহারীও সেই বালিকাকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিল, কিন্তু মেয়ে দেখার পরে মহেন্দ্রই তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল, বিহারী নিতান্ত ভালমানুষের মত সরিয়া দাঁড়াইল। ইহার পরে ঘটনাসূত্রে বিনোদিনীও আসিয়া মহেন্দ্রের বাড়ীতে আশালতার পার্শ্বে স্থান পাইল, এবং তাহার পর হইতেই বিনোদিনীর প্রেমের লীলাখেলা আরম্ভ হইল। প্রেমের খেলা জিনিসটা কখনও হিন্দুর গৃহে প্রচলিত ছিল না, ঘরের বাহিরে অবশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে হিন্দুগৃহে তাহা প্রবেশ করাইয়াছেন। বিনোদিনী মিশনরি মেমের দ্বারা শিক্ষিতা, হয় ত ইংরেজী নবেলও দুই চারিখানা পড়িয়া থাকিবে, তাই flirtation, coquetry প্রভৃতি ইংরেজী ধরণের প্রেমের খেলার মর্ম্ম বুঝিয়াছিল। তাই সে মহেন্দ্র ও বিহারীকে অবলম্বন করিয়া অনেক খেলাই খেলিয়াছে। অথবা বলিতে গেলে গ্রন্থকার স্বয়ং মহেন্দ্র, বেহারী, বিনোদিনী ও আশাকে লইয়া অনেক

খেলা দেখাইয়াছেন—ইহারা যেন তাঁহার হাতের দাবার ঘুঁটী—'চোখের বালি' উপন্যাসখানি একটা শতরঞ্চ খেলার ছক—গ্রন্থকার এই ছকের উপর তাঁহার ইচ্ছামত এই সকল ঘুঁটী চালাইয়া কিস্তি মাৎ করিয়াছেন। উপন্যাসের মধ্যে শতরঞ্চ খেলারই অপর নাম উপন্যাসে মনোবিজ্ঞান-চর্চ্চা। ইহাই না কি এখন খুব উচ্চ দরের আর্ট। যাহা হউক বিনোদিনী, মহেন্দ্র ও বিহারীকে লইয়া কিরূপ খেলা খেলিয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি। বিনোদিনী মহেন্দ্রের গৃহে স্থান পাইয়া, আশার স্বামি-সৌভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষ্যানলে জর্জ্জরিত হইল।

"আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্ব্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত, তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিনী কল্পনাকে যে বেদনায় জাগরূক করিয়া রাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে মহেন্দ্র তাহার মত স্ত্রী-রত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মত ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে, না, তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।"

তাহা ঠিক বুঝিতে না পারুক, বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ধরিবার জন্য নানা ফাঁদ পাতিতে লাগিল। অবশেষে যখন মহেন্দ্র তাঁহার ফাঁদে পড়িল, তখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এই চিঠি লিখিল—

"আমার কাছে কি চাও তুমি? ভালবাসা? তোমার এ ভিক্ষা-

বৃত্তি কেন? জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালবাসাই পাইয়া আসিতেছ, তবু তোমার লোভের অন্ত নাই!

"জগতে আমার ভালবাসিবার ও ভালবাসা পাইবার কোন স্থান নাই। তাই আমি খেলা করিয়া ভালবাসার খেদ মিটাইয়া থাকি। যখন তোমার অবসর ছিল, তখন সেই মিথ্যা খেলায় তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু খেলার ছুটী কি ফুরায় না? ঘরের মধ্যে তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন আবার খেলার ঘরে উঁকি ঝুঁকি কেন? এখন ধূলা ঝাড়িয়া ঘরে যাও। আমার ত ঘর নাই, আমি মনে মনে একলা বসিয়া খেলা করিব, তোমাকে ডাকিব না।"

'আমি মনে মনে একলা বসিয়া খেলিব'—এটা বিনোদিনীর মিথ্যা কথা। কারণ, ইহার পূর্ব্ব হইতেই বিনোদিনী 'বেহারী ঠাকুপো'র দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহাকে অল্পে অল্পে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল।

বাঘিনী যেমন একটা শীকার ধরিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করে, এবং তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইয়া অন্য শীকারের জন্য ধাবিত হয়, বিনোদিনীও সেইরূপ মহেন্দ্রের ঘাড় ভাঙ্গিয়া এখন বিহারীর প্রতি ধাবিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই সে বিহারীর মনে একটা মোহের সঞ্চার করিয়াছিল, তাই বিহারী এমন বাঘিনীর মধ্যেও দেবী-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিল। বিনোদিনী রাত্রে বিহারীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট প্রেম ভিক্ষা চাহিল। বিনোদিনী বলিল—

"শুন ঠাকুরপো, আমি নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে

ফিরাইতে পারিতে, মহেন্দ্র আমাকে ভালবাসে বটে, কিন্তু সে নিরেট অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না। একবার মনে হইয়াছিল তুমি যেন আমাকে বুঝিয়াছ, একবার তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলে—সত্য করিয়া বল—সে কথা আজ চাপা দিতে চেষ্টা করিও না।

"বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম।

"বিনোদিনী। ভুল কর নাই ঠাকুরপো, কিন্তু বুঝিলেই যদি, শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থামিলে কেন? আমাকে ভালবাসিতে তোমার বাধা কি ছিল? আমি আজ নির্লজ্জ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি নির্লজ্জ হইয়া তোমাকে বলিতেছি—তুমিও আমাকে ভালবাসিলে না কেন? আমার পোড়া কপাল! তুমিও কি না আশার ভালবাসায় মজিলে? না, তুমি রাগ করিতে পাইবে না। বোস ঠাকুরপো, আমি কোন কথা ঢাকিয়া বলিব না। তুমি যে আশাকে ভালবাস, সে কথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনও আমি জানিতাম। কিন্তু আশার মধ্যে তোমরা কি দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালই বল, আর মন্দই বল, তাহার আছে কি? বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি কিছুই দেন নাই? তোমরা কি দেখিয়া—কতটুকু দেখিয়া ভোলো! নির্ব্বোধ! অন্ধ!"

এই হিংস্র জন্তুর সঙ্গে বিহারীর অনেক কথা হইল, এবং বিহারী তাহাকে তাহার নবেলি প্রেমের জন্য টিট্‌কারী দিল, এবং অবশেষে

তাহাকে দেশে চলিয়া যাইতে বলিল। বিনোদিনী সেই রাত্রে সেখানে থাকিতে চাহিল। বিহারী বলিল—

"না, এত বিশ্বাস আমার নিজের 'পরে নাই।"

এই কথায় বিনোদিনী একটা scene করিয়া বসিল। সে তৎক্ষণাৎ চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া বিহারীর দুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—

"ঐটুকু দুর্ব্বলতা রাখ ঠাকুরপো। একেবারে পাথরের দেবতার মত পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালবাসিয়া একটু মন্দ হও।"

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পদযুগ বারংবার চুম্বন করিল। বিহারী বিনোদিনীর এই আকস্মিক অভাবনীয় ব্যবহারে ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। তাহার শরীর-মনের সমস্ত গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া আসিল। বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধবিহ্বল ভাব অনুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দুই হাঁটুর উপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল—

"'জীবনসর্ব্বস্ব, জানি, তুমি আমার চিরকালের নও,—কিন্তু আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে ভালবাস! তারপরে আমি আমাদের সেই বনজঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছু চাহিব না। মরণ পর্য্যন্ত রাখিবার মত আমাকে একটা কিছু দেও।'—বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল।"

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনায় নবেলী প্রেম চরম মাত্রায়

(climax) উঠিয়াছে। ইহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত আয়েষার 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' শিশুর আলিঙ্গন।

বিনোদিনী যাহা চাহিয়াছিল, তাহাই পাইল। বিহারী যদিও প্রথমে বিনোদিনীকে বলিয়াছিল—'তোমার এই প্রেমের আলাপ বারো আনা নাটক নবেল।' কিন্তু অবশেষে সে এই বাঘিনীর দ্বারা পরাভূত হইল। তাই দেখিতে পাই যে, 'শনিগ্রহ' মহেন্দ্রের ভবনে উদিত হইয়া 'বন্ধুর প্রণয়, দম্পতির প্রেম, গৃহের শান্তি ও পবিত্রতা একেবারে ছারখার করিয়া দিল', বিহারী প্রবল ঘৃণায় সেই বিনোদিনীকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সুদূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল কৈ? বিহারী চক্ষু বুজিয়া সেই মুখকে স্মৃতিলোক হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনও মতেই তাহাকে আঘাত করিতে তাহার হাত উঠিল না—একটি অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বন তাহার মুখের কাছে আসন্ন হইয়া রহিল, পুলকে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

ইহার পর বিহারী অন্যমনস্ক হইবার জন্য নানা প্রকার সৎকার্য্য আরম্ভ করিল ও পশ্চিমে বেড়াইতে গেল। বিনোদিনী অল্প কয়েক দিন তাহার দেশের বাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়া অবশেষে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে বাহির হইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, এবং অধিকতর নির্লজ্জভাবে সেই প্রেমোন্মত্ত মহেন্দ্রের স্কন্ধে চড়িয়া বেহারীর খোঁজ করিতে লাগিল। পরে এক দিন আলাহাবাদে বেহারীর বাগানবাটীতে মহেন্দ্রের অসাক্ষাতে বিনোদিনীর সঙ্গে বেহারীর দেখা হইল। তখন বেহারীর মনে প্রথমে

বিনোদিনীর প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইল, সে কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বিনোদিনী বলিল—

"আজ যদি তুমি বিমুখ হইয়া এমন করিয়া চলিয়া যাও, তবে আমি তোমারি শপথ করিয়া বলিতেছি আমি মরিব।"

বিহারী তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

"'বিনোদিনী, তোমার জীবনের সঙ্গে আমাকে তুমি জড়াইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি? আমি ত কখনও তোমার পথে দাঁড়াই নাই—তোমার সুখদুঃখে হস্তক্ষেপ করি নাই?' বিনোদিনী কহিল 'তুমি আমার কতখানি অধিকার করিয়াছ, তাহা একবার তোমাকে জানাইয়াছি, তুমি বিশ্বাস কর নাই। তবু আজ তোমার বিরাগের মুখে সেই কথাই জানাইতেছি। ....ঠাকুরপো যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে। এ ঘরে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে এক দিন শয়ন করিয়াছিলে—এ ঘর তোমারই জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি—ঐ ফুলগুলা তোমারি পূজা করিয়া আজ শুকাইয়া আছে। এই ঘরেই তোমাকে বসিতে হইবে।'

"শুনিয়া বিহারীর পুলক সঞ্চার হইল।"

বিহারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাটে বসিল। বিনোদিনী তাহার জন্য পাগল হইয়া কত জায়গায় ঘুরিয়াছে, মহেন্দ্র তাহাকে কিরূপ প্রতারণা করিয়াছে, ইত্যাদি কথা বলিল। বিহারীর হৃদয় আবার গলিয়া গেল। অবশেষে মহেন্দ্র আসিয়া যখন উভয়কে একত্র দেখিয়া টিট্‌কারী দিল, তখন বিহারী বলিল—

"মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে তুমি সংযত হইয়া কথা কও।' বিনোদিনী তাহা শুনিয়া বলিল—'ছি ছি, এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব এ কখন হইতেই পারে না। ছি ছি, এ কথা তুমি মুখে আনিও না।'........বিহারী বলিল 'বিনোদিনী আমি তোমাকে ভালবাসি।' 'সেই ভালবাসার অধিকারে আমি আজ একটি মাত্র স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিব' বলিয়া বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া বিহারীর পদাঙ্গুলি চুম্বন করিল। পায়ের কাছে বসিয়া কহিল 'পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ ইচ্ছা আমি ভূমিসাৎ করিব না।"

'আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে' বিনোদিনীর এই শেষ কালের অনুতাপ আমাদিগের হৃদয় স্পর্শ করে, সন্দেহ নাই। এখানেই কবির আর্টের সার্থকতা। কারণ, পাপের প্রতি ঘৃণা যেমন আমাদের স্বাভাবিক, পাপীর প্রতি করুণাও সেইরূপ আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বিনোদিনীর প্রতি আমাদের যতই ঘৃণা থাকুক, তাহাকে শেষ জীবনে পাপের জন্য অনুতাপ করিতে দেখিয়া

তাহার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হয়। আর, তাহার প্রথম জীবনের হিংস্রবৃত্তি ও ভোগলালসা বিহারীর প্রেমে প্রশমিত হইয়া তাহাকে যথার্থ তপস্বিনী করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দু বিধবার পক্ষে অবশ্যই পরপুরুষের প্রতি প্রেমে তপস্বিনী হওয়াটাও নিতান্ত দোষের, সন্দেহ নাই। তবুও বিনোদিনী যে ভাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার পক্ষে ইহা মন্দের ভাল, সন্দেহ নাই। আমার কথা এই, গ্রন্থকার এক জন হিন্দু বিধবাকে এইরূপ পরপুরুষের প্রেমে তপস্বিনী সাজাইয়া ও তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া সমাজের অনিষ্ট করিয়াছেন। আর এই গ্রন্থের প্রায় পনের আনা ভাগে পাপের চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। এইরূপ পাপ-চিত্রের সহিত পাঠক-পাঠিকার মনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে, পাপের প্রতি ঘৃণাও ক্রমে কমিয়া আসে। এই হিসাবে এই গ্রন্থ সমাজ-শরীরের পক্ষে বিষস্বরূপ।

৫

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালির' পরে, বিধবার প্রেমে পড়া লইয়া আরও কয়েকখানা বই বাহির হইয়াছে। তাহার মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের লোকপ্রিয় সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বড়দিদি' ও 'পল্লীসমাজ' উল্লেখযোগ্য। এই সকল বই অনেকেই পড়িয়াছেন, সুতরাং ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

'বড়দিদি' মাধবী দেবী এক জমীদারের কন্যা; যোগেন্দ্রনাথ নামক একটি সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র যুবকের সহিত তাহার এগার

বৎসর বয়সে বিবাহ হয়; তাহার তিন বৎসর পরেই সে বিধবা হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরে মাধবী স্বামীর উপদেশে ক্রোধ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া স্নেহ মমতা লইয়া পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিল, এবং পিতার সংসারে স্নেহময়ী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ নামক একটি এম, এ, পাশকরা উকীলের ছেলে বিলাত যাইতে না পারিয়া রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়া মাধবীর ছোট ভগ্নী প্রমীলার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইল। ছেলেটি নিতান্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে প্রায়ই অন্যমনস্ক হইয়া mathematicsএর problem চিন্তা করিত। তাহার আচরণ দেখিয়া কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। তাহার নিতান্ত অসহায় অবস্থা দেখিয়া মাধবীর তাহার প্রতি দয়া হইল। সে-ও খাওয়া পরা প্রভৃতি সকল বিষয়ে বড়দিদির প্রতি নিতান্ত নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ক্রমে মাধবীর তাহার প্রতি ভালবাসা জন্মিল। সুরেন্দ্রনাথও অলক্ষিতভাবে বড়দিদিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। প্রমীলাকে রীতিমত না পড়ানর দোষে এক দিন মাধবী তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিল। পরে চাকরের কথায় সুরেন্দ্র সেখান হইতে হঠাৎ এক দিন চলিয়া গেল। তখন মাধবীর শিরে বজ্রাঘাত হইল। পরে কলিকাতার রাস্তায় চলিতে চলিতে সুরেন্দ্র গাড়ী চাপা পড়িয়া হাঁসপাতালে আনীত হইল। সেখানে ক্রমে সুস্থ হইয়া তাহার পিতাকে সংবাদ পাঠাইয়া আনিয়া তাঁহার সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া গেল। পরে সে তাহার মাতামহের বিস্তীর্ণ জমীদারীর মালিক হইয়া বিবাহ করিল। কিন্তু সে জীবনে সুখী হইল না। তাহার ম্যানেজারের

হাতে জমীদারীর ভার ছাড়িয়া দিয়া কুৎসিত আমোদ প্রমোদে গা ঢালিয়া দিল। এ দিকে মাধবীর পিতার মৃত্যুর পরে, তাহার ভ্রাতৃবধূর কর্ত্তৃত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া, সে তাহার বহুকালপরিত্যক্ত স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার স্বামীর বাড়ী সুরেন্দ্রনাথের জমীদারীর মধ্যে। আর এক জন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় সুরেন্দ্র-নাথের ম্যানেজারের সহিত চক্রান্ত করিয়া মাধবীর সম্পত্তি বাকী খাজনার জন্য নিলাম করাইয়া খরিদ করিয়া লইল। হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথ এই কথা জানিতে পারিল, এবং তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া মাধবীর শ্বশুরের গ্রামে যাত্রা করিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন রুগ্ন, বেগে যাইতে যাইতে তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিল। মাধবী সে দিন বাড়ী ছাড়িয়া নৌকায় যাত্রা করিয়াছিল; সুরেন্দ্রনাথ 'বড়দিদি বড়দিদি' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই নৌকা ধরিল। তখন তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে। মাধবী তাহাকে কোলে শোয়াইয়া সেই নৌকায় সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে লইয়া আসিল। সেখানে বড়দিদির কোলে মাথা রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রাণত্যাগ করিল।

গল্পটি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থকারের কলা-কৌশলে মাধবী-চরিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে, এবং নিতান্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। কিন্তু এ স্থানে আমাদের নালিশ এই, তিনি মাধবীকে দেবীরূপে চিত্রিত করিয়া অবশেষে মানবী করিলেন কেন? তাহার স্বামী মৃত্যুকালে তাহাকে বলিয়াছিল—'তুমি সৎপথে থাকিও, তোমার পুণ্যে আবার তোমাকে পাইব।' মাধবী স্বামীর সেই সদুপদেশ ভুলিল কেন? 'যে জীবন

তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, তাহা সকলের সুখে সমর্পণ করিও।' ইহা ত উত্তম কথা। হিন্দু বিধবার ইহাই ত জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। মাধবী ত প্রথমে এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া বাড়ীর সকলের বড়দিদি হইয়াছিল। মাষ্টারটিও তাহাকে সেই সূত্রে বড়দিদি বলিত। সে যেরূপ নির্ম্মলচরিত্র যুবক, তাহার মনে কুভাব আসিতেই পারে না। বড়দিদিও তাহার স্নেহময়ী ভগিনীর স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু সেই পুণ্যময় গৌরবান্বিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া দেবতুল্য স্বামীকে ভুলিয়া মাধবী প্রেমে পড়িল কেন? আমরা গ্রন্থমধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাই না। বিনোদিনীর রক্তে যেমন প্রেমে পড়ার বীজ ছিল, এবং তাহার বাল্যকালের শিক্ষায় সেই বীজের বিকাশ হইয়াছিল, মাধবীর মধ্যে ত আমরা সেরূপ কিছু পাই না। সুরেন্দ্র-নাথের মধ্যেও সে সকল ভাবের একান্ত অভাব। তবে ইহার এই এক উত্তর হইতে পারে, 'Cupid is blind'—কন্দর্প-দেবের দেশকালপাত্র বিবেচনা নাই। কিন্তু ইহা নিতান্ত মামুলী কৈফিয়ৎ। আসল কথা এই, প্রেম না হইলে নবেল হয় না, আর বিধবাকে প্রেমে না ফেলিলে নবেলের উপকরণ কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু গ্রন্থকার ত বাৎসল্য রস ফুটাইয়া অনেক গল্প লিখিয়াছেন। তাঁহার 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি' প্রভৃতি গল্প ত মধুর—অতি মধুর। তিনি 'বড়দিদি'কে বড়দিদি রাখিয়াও বাৎসল্য রস বেশ ফুটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি বীভৎসরসপ্রধান হইত না। তবে আজকাল লোকে

এইরূপ উৎকট রসই বেশী পছন্দ করে। গ্রন্থকারও বোধ হয় তাহাদের খোরাক যোগান আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু এইরূপ অপবিত্র প্রেমের চিত্র দ্বারা সমাজের কি অনিষ্ট হইতেছে, ইহা একবার চিন্তা করা উচিত। মাধবীর এক সখী মনোরমা তাঁহার স্বামীকে মাধবীর প্রেমে পড়ার কথা লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন—

'মাধবী পোড়ারমুখী তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেন না বিধবা হইয়া মনে মনে আর এক জনকে ভালবাসিয়াছে। তোমাদের রাগ হইবার কথা—বিধবা হইয়া সে তোমাদের সধবার অধিকারে হাত দিতে গিয়াছে।...কিন্তু কি জান মনোরমা, তুমি আমাকে আশ্চর্য্য করিতে পার নাই, আমি একবার একটা লতা দেখিয়াছিলাম, সেটা আধ ক্রোশ ধরিয়া ভূমিতলে লতাইয়া লতাইয়া অবশেষে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিয়াছে। এখন তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্পমঞ্জরী। তুমি যখন এখানে আসিবে, তখন দু'জনে সেটিকে দেখিয়া আসিব।'

আমরা এখানে গ্রন্থকারের মাধবীকে মানবী করার কতকটা কৈফিয়ৎ পাইতেছি। তাঁহার মতে, বিধবা আশ্রয়বৃক্ষশূন্য লতার ন্যায় কেন মাটীতে পড়িয়া থাকিবে? তাহার অন্য বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পুষ্পফলে শোভিত হওয়াই জীবনের সার্থকতা। অবশ্য, ইহাই বর্ত্তমান সময়ের liberal view (উদার মত); কিন্তু এই উদার মত হিন্দুসমাজ এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। আমাদের মতে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতা হিন্দু বিধবারূপ লতা ভূমিতলে গড়াইবে

কেন? তাহার স্থান দেবমন্দিরের চূড়ায়। তাহার সেই গৌরবের স্থান হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার পক্ষে যাঁহারা সাহায্য করেন, তাঁহারা সমাজের উপকার না করিয়া অপকার করেন।

এই গ্রন্থকারের "পল্লীসমাজে" আর একটি হিন্দু বিধবার পতনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। যদু মুখুয্যের কন্যা রমা ওরফে রাণী তারিণী ঘোষালের পুত্র রমেশের খেলার সাথী ছিল। সেই সূত্রে দুই জনের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু তখন তাহারা প্রেম কাহাকে বলে, তাহা অবশ্যই বুঝিত না। উভয়ের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু যদু মুখুয্যে ঘোষাল-পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে রাজি হইলেন না। রমার অন্যত্র বিবাহ হইল; কিন্তু বিধির বিধানে সে অল্পকাল পরেই বিধবা হইল। সে তাহার ভাই যতীনকে লইয়া তাহার পিতার ভবনে বাস করিতে লাগিল, এবং পিতার জমীদারী রক্ষা করিতে লাগিল। বিষয় সম্পত্তি লইয়া রমেশের পিতা তারিণী ঘোষালের সঙ্গে যদু মুখুয্যের অনেক বিবাদ বিসংবাদ হইয়াছিল, কিন্তু রমেশ রুড়কী কলেজে অধ্যয়ন করিত, দীর্ঘ কাল বাড়ী আসে নাই। পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করিবার জন্য সে বাড়ী আসিল। তারিণীর ভাই বেণী অত্যন্ত খারাপ লোক। সে রমার সহিত রমেশের অসদ্ভাব ঘটাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ফল তাহার উল্টা হইল। প্রথম দর্শনে রমেশ রমাকে এইরূপ সম্ভাষণ করিল—

"রমার সেই কথাটি আমি কোন দিন ভুলতে পারব না বড়দা! যখন মা মরে গেলেন ও তখন খুব ছোট। সেই বয়সেই আমার

চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, "রমেশদা, তুমি কেঁদ না, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব।" তোর সে কথা বোধ হয় মনে হয় না রমা, না? আচ্ছা আমার মাকে মনে পড়ে ত?"

এই সম্ভাষণে আমরা বাল্যসখীর প্রতি একটি স্নেহশীল উদার হৃদয়ের নির্দ্দোষ প্রীতি ভিন্ন আর কিছু পাই না। কিন্তু রমার মাসীর রূঢ় ব্যবহারে রমেশের সেই প্রীতিপূর্ণ হৃদয় যেন থমকিয়া গেল। রমাও নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া তাহার মাসীকে বলিল—'যে যতখানি বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিব দিয়ে ছড়াতে তোমার মত কেউ ত পেরে উঠত না।'

ইহার পরে রমেশ রমার সঙ্গে আর আত্মীয়তা করিতে যায় নাই। বরং রমেশের পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যখন রমার মাসী আসিয়া বেণীর মাতা বিশ্বেশ্বরীকে অপমান করিয়া গেল, তখন রমার বিরুদ্ধেও রমেশের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রমা কিন্তু তাহার ভাই যতীনের নিকট রমেশের স্কুলের উন্নতির জন্য বদান্যতার কথা শুনিয়া রমেশের প্রতি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহার পর পুকুরের মাছ ধরা লইয়া ও একটা বাঁধ কাটা লইয়া উভয়ের মধ্যে ঘোরতর মনোমালিন্য হইল। তবে ইহার মধ্যে একদিন তারকেশ্বরে হঠাৎ রমার সহিত রমেশের দেখা হইলে রমা তাহাকে তাহার নিজ বাসায় লইয়া গিয়া যত্নপূর্ব্বক খাওয়াইয়াছিল। বিদেশে এক জন প্রতিবেশীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইলে এরূপ কে না করে?

মোট কথা, ইহাতে উভয়ের মধ্যে প্রেমসঞ্চারের কারণ কি? বাল্যকালে অনেক বালক বালিকাই এক সঙ্গে খেলা করে, তাই

বলিয়া বয়স হইলেই কি তাহারা প্রেমে পড়িবে? এরূপ যদি হয়, তাহা হইলে ত বালকবালিকাদিগকে এক সঙ্গে খেলা করিতে দেওয়াই অন্যায়! তুমি হয় ত বলিবে, প্রতাপ শৈবলিনী যখন খেলা করিতে করিতে প্রেমে পড়িয়াছিল, তবে ইহারা পড়িবে না কেন? কিন্তু প্রতাপ শৈবলিনী যেমন প্রেমে পড়িয়াছিল, সে রকম আর কত শত বালকবালিকা প্রেমে পড়ে নাই। আর বাল্যকালের সেই নির্ম্মল, নির্দ্দোষ প্রণয় বিবাহ হওয়ার পরেও স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু passion বা loveএ পরিণত হইবে, তাহার কোন্ কথা আছে? শৈবলিনীর বিবাহের পরে যে কারণে সে স্বামীকে ভালবাসিতে পারিল না, গ্রন্থকার তাহা উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন। এ স্থলে রমার রমেশের সহিত প্রেমে পড়িবার কি কারণ আছে? রমা কুন্দনন্দিনীর ন্যায় অবস্থায় পড়িয়া রমেশকে ভালবাসিতে শেখে নাই। রমা রোহিণীর ন্যায় কোকিলের কুহুতানে মাতিয়া উঠে না। রমা বিনোদিনীর ন্যায় ইংরেজী মেম দ্বারা শিক্ষিতা নহে, এবং বিলাতী হাবভাবও শিক্ষা করে নাই। তবে সেই অর্দ্ধশিক্ষিতা নির্ম্মলচরিত্রা সরলা হিন্দু বিধবা তাহার মৃত পতিকে ভুলিয়া রমেশকে কেন ভালবাসিবে? সেই 'Cupid is blind' ভিন্ন আমরা ইহার কোনও সন্তোষজনক উত্তর খুঁজিয়া পাই না। আর সেই ভালবাসাও শত্রুতা-সাধন করিয়া ভালবাসা, অর্থাৎ, যেমন হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর সহিত শত্রুতা করিয়া সামীপ্যমুক্তি লাভ করিয়াছিল, এ সেইরূপ।

আবার রমেশও খুব উদারহৃদয়, পরোপকারী, উচ্চশিক্ষিত যুবক। সে পল্লীগ্রামের দলাদলি ও নানা প্রকার হীনতা দেখিয়া

তাহার উন্নতিসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিল। কিন্তু তাহার চিত্তেও আবার রমার প্রতি প্রেমসঞ্চার হইল কেন? রমা অবশ্য তাহার বাল্যসখী ছিল, কিন্তু বাল্যসখীর বিবাহ হইয়া গেলেও কি তাহার প্রতি প্রেম পোষণ করিতে হইবে? দুর্ভাগ্যক্রমে সে বিধবা হইলে, তাহার সেই বৈধব্য ব্রত ভঙ্গ করান কি যথার্থ ভালবাসার পরিচয়? অবশ্য, রমেশ সেরূপ কোনও চেষ্টা করে নাই; তবুও রমা যখন এক দিন যতীনকে সঙ্গে করিয়া তাহার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করিতে আসিল, তখন রমেশ হৃদয়ের আবেগে বলিল—

'তোমাকে ভালবাসতাম রমা। আজ আমার মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধ করি কেউ কখনো বাসেনি!···তুমি ভাব্‌চ তোমাকে এ সব কাহিনী শোনানো অন্যায়। আমার মনেও সেই সন্দেহ ছিল বলেই, সে দিন তারকেশ্বরে যখন একটি দিনের যত্নে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেলে তখনও চুপ করেছিলাম।'

রমা বলিল—

'তবে আজকেই বাড়ীতে পেয়ে আমাকে অপমান করচেন কেন?'

রমেশ বলিল—

'অপমান? কিছু না। এর মধ্যে মান অপমানের কোন কথা নেই। এ যাদের কথা হচ্ছে, সে রমাও তুমি কোন দিন ছিলে না, সে রমেশও আমি আর নেই। বিশ্বাস হয়েছিল,—তুমি যা' ইচ্ছা বল, যা' খুসী কর, কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে

পারবে না। বোধ করে ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলায়—একদিন আমাকে ভালবাসতে, আজও তা' একেবারে ভুলতে পারনি। তাই ভেবেছিলাম, কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে—তোমার ছাওয়ায় বসে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব।'

রমেশের এই আবেগপূর্ণ হৃদয়ের প্রেম-প্রলাপ অবশ্যই রমার হৃদয়ে প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিল। ইহার পর যদিও রমা ভৈরব আচার্য্যের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়ার সময় সত্য গোপন করিয়া রমেশকে জেলে দেওয়ার সহায়তা করিয়াছিল, সে কেবল অভিমান-ভরে, এবং নিজের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য। কিন্তু রমেশ জেলে গেলে তাহার ঘোর অনুতাপ আরম্ভ হইল, এবং পরে সে রোগে শয্যাশায়িনী হইল। অবশেষে বিশ্বেশ্বরী যখন রমাকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন, তখন রমা তাঁহাকে বলিল—

'আমি যখন আর থাকব না, তখনও যদি তিনি আমাকে ক্ষমা করতে না পারেন, তবে শুধু এই কথাটি আমার হ'য়ে তাঁকে বোলো জ্যাঠাইমা, যত মন্দ বলে তিনি আমাকে জানতেন, তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েছি, তার অনেক দুঃখও যে আমি পেয়েচি— তোমার মুখের কথাটি হয় ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।'

বিশ্বেশ্বরী রমার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বুক দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—

'চল মা, আমরা কোন তীর্থে গিয়া থাকি। যেখানে বেণীও

নাই, রমেশও নাই,—যেখানে চোখ খুললেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে—সেইখানে যাই। আমি সব বুঝতে পেরেচি রমা। যদি যাবার দিনই তোর এগিয়ে এসে থাকে, তবে এ বিষ বুকে পুরে জ্বলে পুড়ে সেখানে গেলে ত চলবে না। আমরা বামুনের মেয়ে, সেখানে যাবার দিনটিতে আমাদের তার মতই গিয়ে উপস্থিত হ'তে হবে।'

রমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস আয়ত্ত করিতে করিতে শুধু কহিল,—

'আমিও তেমনি করেই যেতে চাই জ্যাঠাইমা।'

ইহার পরে রমেশ জেল হইতে ফিরিয়া আসিলে রমা ঝিকে দিয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল—

'আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে, আজ আশীর্ব্বাদ করে আমায় বিদায় দাও রমেশদা, আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আমার স্বামীর কাছে যেতে পারি।'

রমার এই শেষ কথাগুলি পড়িতে পড়িতে চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে, সন্দেহ নাই। এখানেই কবির আর্টের বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া রমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—

'ঠাকুরাণী, এত দিন তোমার সেই স্বামী বেচারা কোথায় ছিল? তোমার বাল্যসখা রমেশকে পাইয়া তাহাকে ভুলিলে কেন? তুমি না অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তুমি বুদ্ধিবলে পিতার জমীদারী শাসন করিয়া থাক, কিন্তু নিজের চিত্ত দমন করিতে পারিলে না? তুমি এত

দূর সতর্ক যে, রমেশের চাকর ভজুয়া তোমার বাড়ীতে পুকুরের ভাগের মাছ চাহিতে আসিয়াছিল বলিয়া তুমি তাহার নামে পুলিসে ডাইরী করাইয়া রাখিলে, অথচ তুমি রমেশের সঙ্গে ব্যবহারে একটুও সাবধান হইতে পারিলে না? তুমি যে এত ঘন ঘন তারকেশ্বরে গিয়া শিবপূজা কর, তাহার সার্থকতা কোথায়? তোমার এই পতন নিতান্তই ইচ্ছাকৃত, ইহা তোমার একটা সখ; অথবা গ্রন্থকারের সখ—কারণ প্রেম না হইলে নবেল হয় না।'

গ্রন্থকার নবেল লেখার জন্য তাঁহার 'পল্লীসমাজে' এই অবৈধ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পল্লীগ্রামের দলাদলি ও কলহদূষিত বায়ু যে আরও দূষিত করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার ফলে পল্লীগ্রামে অতি কুৎসিত আকারে প্রচলিত স্বকীয় ও পরকীয় প্রেম সভ্য বেশ ধারণ করিয়া সাধারণের ঘৃণার স্তর কাটাইয়া উঠিতে পারে।

৬

বিধবার প্রেমে পড়া সম্বন্ধে আর একখানি নবেলের সমালোচনা করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। এই পুস্তকখানিকে অন্য শ্রেণীর নবেলের আদর্শ (type) মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, ইহাতে আর্টের অত্যন্ত অভাব, কেবল নবেল লিখিতে হইবে বলিয়া নবেল লেখা। এই নবেলের নাম "কর্ম্মের পথে"—ইহার লেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার, বঙ্গ-সাহিত্যে অপরিচিত নহেন। তিনি তাঁহার "গোবর গণেশের গবেষণা" লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অর্থাৎ, মৃতপ্রায় হিন্দু সমাজের পৃষ্ঠে বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়া ডাক্তার

রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সংস্কারকগণের হাততালি লাভ করিয়াছেন। তবে সেই পুস্তকখানিতে অনেক ভাল কথাও আছে। কিন্তু 'ভাই হাততালি' লোককে যে মাটী করে, ৺ সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থকারও সেই 'ভাই হাততালি'র পরামর্শে, বোধ হয়, সমাজ-সংস্কারের অভিপ্রায়ে এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তিনি ইহাতে আগাগোড়া পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠক-পাঠিকার মনে একটা repulsion অর্থাৎ বীভৎস রসের সঞ্চার করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের সরকারী উকীল রাধাবল্লভ বাবু নিতান্ত লম্পট স্বভাবের লোক। তিনি হেমাঙ্গিনী নাম্নী একটি বালবিধবার রূপে মত্ত হইয়া তাহার ভাই নন্দলালকে মুহুরীগিরি চাকুরী দিলেন, এবং নানা প্রকারে তাহাকে ফুসলাইবার চেষ্টা করিলেন। গোলাপ নামে এক পানওয়ালীর সহিত রাধাবল্লভের খুব ভাব। লেখক এমনই কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত যে, কৃষ্ণনগরের গবর্ণমেণ্ট প্লীডারকে বার-লাইব্রেরীতে বসাইয়া তাহার সঙ্গে প্রেমালাপ করাইতেছেন। যাহা হউক, রাধাবল্লভ বাবু এই গোলাপের দ্বারা হেমাঙ্গিনীর সতীত্বনাশের অনেক চেষ্টা করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন দারোগার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া হেমাঙ্গিনীর ভাই নন্দলালকে এক স্বদেশী মোকদ্দমার আসামী করিয়া দিলেন। নন্দলালের জেল হইল, কিন্তু হেমাঙ্গিনী চতুরতা করিয়া এক দিন রাধাবল্লভের বাড়ীতে গিয়া নন্দলালকে আপীলে খালাস করাইল। পরে নন্দলাল হেমাঙ্গিনীকে লইয়া কৃষ্ণনগর

পরিত্যাগ করিল, এবং কলিকাতার সন্নিহিত কামারহাটীতে এক চটের কলে চাকুরী লইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। সুরেশ নামে নন্দলালের এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সেই এই উপন্যাসের নায়ক। কিন্তু নায়িকা হেমাঙ্গিনী নহে—হেমাঙ্গিনী আগাগোড়া তাহার চরিত্র ঠিক রাখিয়াছে, এবং পাপচরিত্রবহুল এই উপন্যাসে তাহার চরিত্র নিবিড় অন্ধকারে আলোকরশ্মির ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। বাগবাজারের কাশীনাথ নামে এক লম্পটস্বভাব ধনী জমীদারের প্রথম পক্ষের স্ত্রী পারুল নামে একটি শিশু কন্যা রাখিয়া মারা গেলে তিনি সুলোচনাকে বিবাহ করেন। যেমন স্বামী, তাহার তেমন স্ত্রী। সুলোচনাও তাঁহাদের এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে ভ্রষ্টা। সেই প্রথম পক্ষের কন্যাটীর অতি অল্প বয়সে বিবাহ হয়, এবং বিবাহের পরেই সে বিধবা হইল। সে যখন যৌবনে পদার্পণ করিল, তখন সেই বা তাহার পিতা ও বিমাতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করিবে কেন? কামারহাটীর নিকট এঁড়েদহে কাশী বাবুর এক বাগানবাড়ীতে সে তাহার পিসীর সঙ্গে গিয়া প্রায়ই থাকিত, এবং তাহার প্রস্ফুটিত রূপ আরও ফুটাইবার জন্য সাজগোজ করিয়া বাগানে বেড়াইত। পারুল কোনও দিনই বৈধব্যোপযোগী সংযম করিতে শেখে নাই, আর তাহার পিতৃভবনও সংযমশিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না। এই অবস্থায় এক দিন সুরেশের সঙ্গে হঠাৎ তাহার দেখা হইল, আর অমনই 'পদার্থ-বিজ্ঞানের বিপরীত-বিদ্যুতাক্রান্ত দুইটি বস্তুর ন্যায় এই যুবক-যুবতীর চোখে-চোখে মিলন হইল।' এই কথা বলিয়া, পাছে কেহ মনে করেন, গ্রন্থ-

কারের পদার্থ-বিজ্ঞান তত বেশী পড়া নাই, সেই ভয়ে তিনি আবার বলিতেছেন, 'এই "চোখোচোখিই" বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বা স্পার্ক।' পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁহার বিদ্যা কম কি না, জানি না, কিন্তু প্রেম-বিজ্ঞানে তাঁহার বিদ্যা নিতান্তই বেশী, তাই তিনি বলিতেছেন,—উভয়ের চোখোচোখি হওয়ায় 'সুরেশ লজ্জায় চক্ষু ফিরাইল—পারুল কিন্তু একাধিক বার তাঁহার প্রতি অতৃপ্ত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পুরুষ ও রমণীর প্রথম প্রেমদৃষ্টির সময় পুরুষ লজ্জিত হয়, কিন্তু রমণী সাহসের পরিচয় দেয়।' তোমরা সকলে জানিয়া রাখ, ইহাই গোবর গণেশের 'love's philosophy.'

যাহা হউক, লেখক সুরেশকে যেরূপ একজন আদর্শ সুশিক্ষিত স্বদেশপ্রাণ যুবক বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার পক্ষে এরূপ একটি অপরিচিত যুবতী দেখিয়া কি করা উচিত? লেখকের সে কাণ্ডজ্ঞান মোটেই নাই। তিনি শুনিয়াছেন, প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়, তাহার দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিবার সময় থাকে না। তাই পারুল কুমারী, সধবা কি বিধবা, তাহার জাতি কুল কি, এ সব না জানিয়াও সুরেশ তাহার প্রেমে পড়িল। গ্রন্থকার অবশ্য সুরেশের জন্য (অথবা নিজের জন্য) পাঠকের নিকট ক্ষমা চাহিয়াছেন। তাঁহার অজুহাত এই—'কিন্তু প্রেমের তড়িত-স্পর্শে হৃদয় আপনি স্পন্দিত হয়, দৃষ্টি বল্গা-বিচ্যুত অশ্বের ন্যায় স্বতঃই ধাবিত হয়। এ কার্য্যে ভালমন্দ, ন্যায়ান্যায়, বৈধাবৈধের তর্ক চলে না।' কেন চলে না? সুরেশ না Science কোর্সে বি এ. পাশ করিয়া দেশের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে চাহে?

তাহার যদি এতটুকু চিত্তসংযমের ক্ষমতা না থাকে, সে যদি এতদূর ন্যায়ান্যায়-হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়, তবে তাহার শিক্ষার মূল্য কি ?

অনেক নায়ক নায়িকা ত প্রেমে পড়ে—তাহাদের প্রেম মনে মনে থাকে—বাহিরে প্রকাশ পাইলেও ভোগ-লালসার বশবর্ত্তী হয় না। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী পর্য্যন্ত এক দিনের তরেও মহেন্দ্র বা বিহারীর প্রতি লালসাসক্ত হয় নাই। কিন্তু এই গ্রন্থকার আমাদের সমাজ-সংস্কার করিবার প্রয়াসী। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা যেমন অত্যন্ত উৎসাহের সহিত মদ্য ও গোমাংস ভক্ষণ করিতেন, এবং প্রতিবেশীর বাড়ীতে গরুর হাড় ফেলিয়া নিজেদের reforming zealএর পরিচয় দিতেন, এই লেখকটির zeal'ও সেইরূপ। তাঁহার এই নায়ক নায়িকা প্রথম দর্শনের পরে পরস্পর মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল—সুরেশ তাহাকে প্রেমপূর্ণ এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইল—কিন্তু পারুল লেখা পড়া জানে না, সে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মানভরে ফিরাইয়া দিল—পরে সেই বাগানে এক দিন সন্ধ্যার পরে উভয়ের মিলন হইল—তখন পারুল বলিল, 'তা হলে তুমি আমাকে ভালবাস ?' সুরেশ বলিল, 'নিশ্চয়ই ! আমি তোমার জন্য পাগল হয়েছি।' এই কথা বলিয়া সুরেশ পারুলের মুখ চুম্বন করিল ; পারুল তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। পরে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 'সুরেশ ও পারুল দুই দিন নিশাযোগে এই লতাকুঞ্জে মিলিত হইয়াছিল। মিলনানন্দের দীর্ঘকালও তাহাদের নিকট ক্ষণস্থায়ী

মুহূর্ত্তমাত্র বলিয়া মনে হইত।'...'সুরেশ ও পারুল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা নিদ্রা গিয়া পরস্পরকে স্বপ্নে দেখিবে। তাহারা সে প্রতিজ্ঞা পালন করিত। সুরেশ ভাবিত, 'পারুলের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর তাহার সম্পূর্ণ দখল আছে—এ সকল তাহারই সম্পত্তি, তাহারই ঐশ্বর্য্য।'

পাঠক মনে রাখিবেন, এখন পর্য্যন্ত ইহাদের বিবাহ হয় নাই। বিবাহ করিবার পরে স্ত্রীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর এইরূপ অধিকার ত সকল স্বামীরই হইয়া থাকে। তাহা হইলে আর সংস্কারের প্রয়োজন কি? লেখক ইহারও একটা কৈফিয়ৎ দিতে ভুলেন নাই। তিনি বলেন, ইহা অতি পবিত্র 'অতীন্দ্রিয় অনাবিল প্রেম, আর এই অতীন্দ্রিয় অনাবিল প্রেমের স্রোত কানায় কানায় ভরিয়া উঠিলেও সংযমের বেলাভূমি অতিক্রম করে না। ইন্দ্রিয় চিরদিনই অতীন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়া থাকে।' অর্থাৎ, যে প্রেমে আত্মহারা হইয়া সুরেশ পারুলের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর তাহার দখল সাব্যস্ত করিল, তাহাতেও সংযমের সীমা অতিক্রান্ত হইল না, আর তাহাও অতীন্দ্রিয় পবিত্র প্রেম! আসল কথা এই, লেখক বৈষ্ণব কবিতায় পড়িয়াছেন—'প্রতি অঙ্গ তরে কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর', আবার আধুনিক কবিদের লেখায় অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথাও পড়িয়াছেন। নায়ক-নায়িকার প্রেমের গভীরতা ও পবিত্রতা দেখাইবার জন্য তাঁহার এই পড়া কথা যদি এক জায়গায় না খাটাইতে পারিলেন, তবে তাঁহার উপন্যাস লেখার সার্থকতা কি? তাঁহার গবেষণারই বা সার্থকতা কোথায়? তবে ইহা গোবর গণেশের গবেষণা হইতে

পারে, ইহা কবির আর্ট নহে। কারণ, পড়া কথা বা শোনা কথা নকল করিয়া গেলে আর্ট হয় না; art is a feeling.

যাহা হউক, যুবক-যুবতীর লালসাদীপ্ত 'অনাবিল অতীন্দ্রিয় প্রেম' নামে কথিত এই নিতান্ত gross love অর্থাৎ কামের চিত্র লইয়া আর অধিক নাড়াচাড়া করিব না। সুরেশ সেই দুই রাত্রি লতাকুঞ্জে পারুলের সহিত যাপন করিবার পরে, হঠাৎ পারুল তাহাকে সংবাদ না দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। তখন সুরেশ তাহার বিরহে পাগল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে কাশী বাবুর কলিকাতার ঠিকানা জানিত না। তিন মাস পরে পারুল, প্রাণের আবেগে, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও শিশুশিক্ষা পড়িয়া, তাহাদের এক মালীর হাতে একখানা ক্ষুদ্র চিঠি হেমাঙ্গিনীর বাসায় পাঠাইয়া দিল। সেই হিজিবিজি-লেখা খোলা চিঠি হেমাঙ্গিনীর হাতে পড়িল। তিনি এক দিন বাগবাজারে মদনমোহন দেখিতে গিয়া পারুলকে তাহাদের বাড়ীতে দেখিয়া আসিলেন। এ দিকে সুরেশ সন্ন্যাসী হইবে বলিয়া হেমাঙ্গিনীকে চিঠি লিখিয়াছিল। কিন্তু পাঁচুমামার উপদেশ শুনিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। গ্রন্থকার তাঁহার সমাজ-সংস্কার ও স্বদেশী বক্তৃতা দিবার জন্য পঞ্চানন ওরফে পাঁচু মামা নামক এক প্রবীণ ব্যক্তিকে ভাড়া করিয়া আনিয়াছেন, অর্থাৎ গ্রন্থের মধ্যে জোর করিয়া বসাইয়াছেন। সুরেশ তাঁহার এক জন চেলা। এই পাঁচু মামা ও হেমাঙ্গিনী ঘটকালি করিয়া পারুলের সঙ্গে সুরেশের বিবাহ দিলেন। তখন কাশীবাবুর মৃত্যু হইয়াছিল; তাঁহার বিধবা স্ত্রী সুলোচনার পারুলের উপর কোনও

অধিকার ছিল না। পারুলের পিসী বিবাহে সম্মতি দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। তবে এ বিবাহটা নিতান্ত লৌকিক ব্যাপার; গ্রন্থকারের মতে আসল বিবাহ 'সেই বাগানবাটীতে এক প্রকার গোপনেই সমাধা হইয়াছিল।' আমরাও বলি, 'ঠিক কথা।' এই নবেলের নবেলত্ব এখানেই একরূপ শেষ হইল। ইহার পরে সুরেশ দেশের উন্নতির জন্য নানা কাজ আরম্ভ করিল; তাহার মধ্যে এঁড়েদহের সেই বাগানবাড়ীতে ঔষধ প্রস্তুতের এক কারখানা খুলিল। এদিকে সুলোচনা তাহার ভগিনীপতি কৃষ্ণনগরের উকীল সেই রাধাবল্লভ বাবুর পরামর্শে সুরেশ ও পারুলকে কাশীবাবুর বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। তখন দেশে এনার্কিষ্টদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সুরেশকে এই এনার্কিষ্টদলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া একটা মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি করা হইল। কিন্তু সুরেশের কিছুই হইল না। গ্রন্থের এই অংশে কোনও নবেলত্ব নাই, ইহা যেন এনার্কিষ্ট মামলার ইতিহাস। তবে গ্রন্থের শেষ ভাগে অনেক বীভৎস ব্যাপার সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। এক জন এনার্কিষ্টের হাতে রাধাবল্লভের পাপময় জীবনের অবসান হইল। আর সুলোচনা তাহার বাড়ীর সরকার রসিকের প্রেমে পড়িয়া যে কাণ্ড করিয়া বসিল, তাহাতে তাহারও মৃত্যু হইল। কিন্তু তাহাদের সেই প্রেম 'অতীন্দ্রিয় প্রেম' কি না, সে সম্বন্ধে লেখক কোনও গবেষণা করেন নাই। আমরাও তাঁহাকে এখানেই ছুটী দিতেছি। তাঁহার পুস্তকের দ্বারা সমাজসংস্কার হউক, আর না-ই হউক, তাহা যে যুবক-যুবতীর চিত্তে লালসার ইন্ধন যোগাইতে

সমর্থ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এত অধিক পাপচিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা দ্বারা যে পাঠক-পাঠিকার মনে পাপের প্রতি ঘৃণা কমিয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ?

৭

সধবার প্রেম—(বিবাহের পূর্ব্বে জাত)

বিধবার প্রেমে পড়া হিন্দুসমাজের আদর্শ অনুসারে ঘোরতর পাপ-কার্য্য। এই সকল পাপ-চিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া কোনও কোনও হিন্দু বিধবা সংযমভ্রষ্টা হইতে পারেন, এই কারণে সমাজের পক্ষে এই সকলের চিত্রাঙ্কন নিতান্ত দূষণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সধবা স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত প্রেম করাটা সকল সমাজেই নিন্দনীয়, এবং তাহার চিত্রাঙ্কন সকল সমাজের পক্ষেই অনিষ্টজনক। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেক উপন্যাসলেখক বিলাতী উপন্যাসকে আদর্শ করিয়া সধবার পরপুরুষের প্রতি প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং করিতেছেন।

সধবার পরপুরুষাসক্তি দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ—কুমারী অবস্থায় এক জনকে ভালবাসিয়া পরে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হইলেও পূর্ব্ব প্রেম-ভাজনকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ—এক জনের সঙ্গে বিবাহের পরে অন্য পুরুষকে ভালবাসা। ইহার মধ্যে প্রথমটিতে বরং আমরা অবস্থাবিশেষে সেই রমণীকে কৃপার পাত্র মনে করিয়া ক্ষমা করিতে পারি ; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সেই রমণী কোনও অবস্থায়ই ক্ষমার যোগ্য নহে। কিন্তু যে

সকল লেখকের আর্ট আছে, তাঁহারা এই দ্বিতীয়টিতেও পরপুরুষা-সক্ত রমণীকে নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া তাহার প্রতি পাঠকের সমবেদনা আকর্ষণ করেন। ইহাতে তাঁহাদের আর্টের সার্থকতা হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমাজের হিসাবে তাহা অত্যন্ত দূষণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে তাঁহার শৈবলিনী-চরিত্রে, প্রথম শ্রেণীর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার আর্টের গুণে এই বুড়ো বয়সেও 'শৈবলিনী সৈ' পড়িতে পড়িতে আমাদের চোখে জল আসে। প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যকালের গভীর প্রণয় টেনি-সনের এনক-আর্ডেন (Enoch arden) কে স্মরণ করাইয়া দেয়। শৈবলিনীর চন্দ্রশেখরের সঙ্গে, এবং প্রতাপের সুন্দরীর সঙ্গে বিবাহ হইলেও, উভয়ের মধ্যে সেই প্রেম রহিয়া গেল। শৈব-লিনী তাহার দেবতুল্য স্বামীকে পাইয়াও সেই বাল্যকালের প্রেম ভুলিতে পারিল না। চন্দ্রশেখর বয়সে প্রবীণ, তিনি তাঁহার পুঁথি লইয়াই সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন; তিনি শৈবলিনীকে আপনার করিয়া লইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। হয়ত শৈবলিনী তাঁহার প্রেমের স্বাদ পাইলে, প্রতাপকে ভুলিতে পারিত। কিন্তু যখন গৃহে তাহার প্রেম-পিপাসা মিটিল না, তখন সে প্রতাপকে পাইবে, এই পাগলের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া লরেন্স ফষ্টরের নৌকায় গিয়া উঠিল। গ্রন্থকার কিন্তু শৈবলিনীকে কখনও ফষ্টরের সহিত মিলিত হইতে দেন নাই। আবার, প্রতাপ শৈবলিনীকে ফষ্টরের কবল হইতে উদ্ধার করিবার পর, যখন প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর সাক্ষাৎ হইল,

তখনও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। শৈবলিনীর পাপ মানসিক পাপ; সেই পাপের জন্য শৈবলিনীর প্রতি আমাদের যথেষ্ট সমবেদনার উদ্রেক হয়। তাহা হইলেও গ্রন্থকার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুষানলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রন্থের অধিকাংশ ভাগই সেই প্রায়শ্চিত্তের কথায় পরিপূর্ণ। ইহা দ্বারা পাঠকের মনে পাপীর প্রতি সহানুভূতি ও পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়। প্রতাপ শৈবলিনীর কল্যাণকামনায় যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া আপনার মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল, তখন তাহা দেখিয়া হৃদয়ে উচ্চ ভাবের সঞ্চার হয়। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টের সার্থকতা। তবুও প্রেমের মাদকতা এত বেশী যে, শৈবলিনীর কঠোর দণ্ড দেখিয়াও লোকের মনে পাপাসক্তি কমে না। এবং শৈবলিনীর অনুকরণে পরপুরুষাসক্তি সমাজে চলিয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সার রবীন্দ্রনাথের কোনও উপন্যাসে আমরা এই শ্রেণীর প্রেমের চিত্র পাই নাই। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'দেবদাসে' এই শ্রেণীর আর একটি প্রেমচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহা তাঁহার আর্টের গুণে নিতান্ত মর্ম্মস্পর্শী ও tragic হইয়াছে। যে নারী বিবাহের পরে পরপুরুষকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে থাকে, সে দ্বিচারিণী, সন্দেহ নাই। দ্বিচারিণী রমণী সকল সমাজেই নিন্দনীয়। কিন্তু লেখক পার্ব্বতীকে এরূপ অবস্থাপরম্পরার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন যে, তাহার প্রতি আমাদের রাগ হয় না, বরং তাহার দুরদৃষ্টের জন্য দুঃখ হয়। প্রতাপ-শৈবলিনী অথবা রমা-রমেশের

ন্যায় পার্ব্বতী ও দেবদাস বাল্যকালে একসঙ্গে খেলা করিত, এক পাঠশালায় পড়িত, এক সঙ্গে দুষ্টামী করিত। দেবদাস তাহার দুষ্টামীর জন্য পাঠশালা হইতে তাড়িত হইল; পার্ব্বতীও গুরুমহাশয়ের নামে মার-পিটের মিথ্যাভিযোগ উপস্থিত করিয়া পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করিল। কিন্তু দেবদাস অত্যন্ত গোঁয়ার; সে পার্ব্বতীকে অতি সামান্য কারণে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিত। তবুও পার্ব্বতী তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারিত না। ক্রমে দেবদাস বড় হইল; তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠান হইল। সেখানে গিয়া তাহার লেখাপড়ায় মনোযোগ হইল, এবং কলিকাতার সংসর্গে তাহার অনেক গ্রাম্যতা দোষ কাটিয়া গেল, সে সব্যভব্য বাবু হইল। সে প্রথম-প্রথম পার্ব্বতীকে প্রায়ই পত্র লিখিত—ক্রমে তাহাও বন্ধ হইল। গ্রীষ্মের বন্ধে দেবদাস বাড়ীতে আসিয়া পার্ব্বতীদের বাড়ী গেল, কিন্তু পার্ব্বতীর সঙ্গে বেশী কথা কহিতে পারিল না, তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। পার্ব্বতীর বয়স তের বছর হইয়াছে। পিতা মাতা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পার্ব্বতী দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী, দেবদাসের পিতা খুব বড় লোক; পার্ব্বতীর মাতা দেবদাসের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পার্ব্বতী 'বেচাকেনা ঘরের মেয়ে, তার ওপর আবার ঘরের পাশে কুটুম্ব, ছিঃ ছিঃ!'—এই কারণে দেবদাসের পিতার এ বিবাহে মত হইল না। পার্ব্বতীর পিতাও জেদ করিলেন, যত শীঘ্র হয় তিনি অন্য পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন। তাঁহার মেয়ে ত কুৎসিত নয়, পাত্রের অভাব কি? কিন্তু তাঁহার এই সংকল্প শুনিয়া পার্ব্বতীর

মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল (‘বাজ’ নহে!)। সে তাহার সখী মনোরমাকে বলিল, ‘আমি জানি আমার স্বামীর নাম দেবদাস······ আমি দেবদাসকে জিজ্ঞাসা করিব, তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন কি না?’—‘বলিস্ কি? লজ্জা কর্‌বে না?’ ‘লজ্জা কি? তোমাকে বল্‌তে কি লজ্জা কল্লুম?’ ‘মনোদিদি, তুই মিছামিছি মাথায় সিন্দূর পরিস্। কাকে স্বামী বলে, তা-ই জানিস্ নে। তিনি আমার স্বামী না হ’লে, আমার সমস্ত লজ্জা সরমের অতীত না হ’লে, আমি এমন করে মর্‌তে বসতুম না। তা ছাড়া দিদি, মানুষ যখন মর্‌তে বসে, তখন সে কি ভেবে দেখে, বিষটা তেতো কি মিষ্টি? তাঁর কাছে আমার কোন লজ্জা নেই।’ একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মুখে এরূপ কথা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না কি? কিন্তু লেখক তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, পার্ব্বতী অকালপক্ক বালিকা। তাহা হইলেও যেন কেমন-কেমন লাগে। যাহা হউক, পার্ব্বতী যথার্থই এক দিন গভীর রাত্রে একাকিনী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দেবদাসদের বাড়ীর সদর-দরজায় দরোওয়ানদিগের ও অন্দরে দাসদাসীদিগের হাত এড়াইয়া দোতালায় দেবদাসের শয়নগৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। দেবদাস হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া বলিল, ‘এমন কাজ কর্‌লে পারু! এত রাত্রে —ছি ছি, কাল মুখ দেখাবে কেমন কোরে?’ পার্ব্বতী বলিল, ‘আমার সে সাহস আছে।’ পার্ব্বতী মনে মনে নিশ্চয় জানিত, দেবদাস তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার সমস্ত লজ্জা ঢাকিয়া দিবে। সে দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল,

'এইখানে একটু স্থান দেও দেবদা!' দেবদাস অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বাপ মায়ের একেবারে অমত, তা জানো?—তবে আর কেন?' পার্ব্বতী তাহার পা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। পরে দেবদাস পার্ব্বতীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে রাখিতে গেল। পার্ব্বতী বলিল, 'যদি দুর্নাম রটে, হয় ত কতকটা উপায় হতে পারবে।'

একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার এইরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার বাস্তব-জীবনে প্রায়ই দেখা যায় না। সাহিত্যেও ইহার একমাত্র তুলনা এই গ্রন্থকারের 'অরক্ষণীয়া'-চরিত্রে। মনোরমার সহিত কথোপ-কথনে গ্রন্থকার পার্ব্বতীর মুখ দিয়া যে কৈফিয়ৎ বাহির করিয়াছেন, তাহাও এই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার মুখে শোভা পায় না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। যাহা হউক, লেখকের বর্ণনার গুণে এই অসম্ভব ব্যবহারও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে।

ইহার পরে দেবদাস তাহার পিতার নিকট পার্ব্বতীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। পিতা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, জননী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, দেবদাস তাহার তোড়-জোড় বাঁধিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া এই মর্ম্মে পার্ব্বতীকে পত্র লিখিল—'তোমাকে সুখী করিতে গিয়া পিতা মাতাকে এত বড় আঘাত দিব, তাহা আমার দ্বারা অসাধ্য, আর আমি যে তোমাকে বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমার কোনও দিন মনে হয় নাই—আজও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতেছি না, শুধু এই আমার বড় দুঃখ, যে তুমি আমার জন্য কষ্ট পাইবে!'

এই শেষ কথাটা লিখিয়া দেবদাসের মনে অনুতাপ হইল। এই শেষ কথাটাই উভয়ের জীবনের কাল হইল। দেবদাসের স্বভাব এই যে, সে কোনও কাজই ভাবিয়া চিন্তিয়া করিতে পারে না, নিতান্ত ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করে। সে পার্ব্বতীকে ঐ চিঠি লিখিয়া অনুতপ্তমনে কলিকাতা হইতে বাড়ী গেল। এ দিকে হাতিপোতার জমীদার ভুবনমোহন চৌধুরীর সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। ভুবন বাবু প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে প্রৌঢ় বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেছেন। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্বে পার্ব্বতী দু-প্রহর বেলায় কলসী-কক্ষে বাঁধে জল আনিতে গিয়া দেখিল, দেবদাস এক ফুলগাছের আড়ালে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে। দেবদাস পার্ব্বতীকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'আমি এসেছি পারু!' পার্ব্বতী বলিল, 'কেন?' 'তুমি আসতে লিখে-ছিলে, মনে নাই?' 'না।' অবশেষে দেবদাস বলিল, 'আমি যেমন করিয়া পারি, মা বাপের মত করিব।'

পার্ব্বতী বলিল, 'তোমার মা বাপ আছেন, আমার নেই?'...... 'তোমাতে কিছুমাত্র আমার আস্থা নাই। আমি যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি ধনবান, বুদ্ধিমান—শান্ত স্থির। তিনি ধার্ম্মিক। আমার মা-বাপ আমার মঙ্গল কামনা করেন; তাই তাঁরা তোমার মত এক-জন অজ্ঞান, চঞ্চলচিত্ত, দুর্দ্দান্ত লোকের হাতে আমাকে কিছুতেই দিবেন না। তুমি পথ ছেড়ে দাও।' ইহার পরে উভয়ের ঝগড়া হইল। দেবদাস রাগে অপমানে ভীষণ হইয়া উঠিয়া বলিল, 'শোন পার্ব্বতী, অতটা রূপ থাকা ভাল নয়। অহঙ্কার বেড়ে যায়।

দেখ্‌তে পাও না, চাঁদের অত রূপ বলেই তাতে কলঙ্কের কালো দাগ; পদ্ম অত সাদা বলেই তাতে কালো ভোমরা বসে থাকে। এস, তোমার মুখেও কিছু কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিই।' এই বলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সেই ছিপের বাঁট ঘুরাইয়া পার্ব্বতীর মাথায় আঘাত করিল, সঙ্গে সঙ্গেই কপালের উপর বাম ভ্রূর নীচে পর্য্যন্ত চিরিয়া গেল। চক্ষের নিমিষে সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিয়া গেল।

'দেবদা' কোর্‌লে কি?' বলিয়া পার্ব্বতী মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। দেবদাস তখন তাহার জামা ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল। পার্ব্বতী বলিল, 'দেবদা, কাউকে যেন বলো না'— 'মাপ কর আমাকে।' দেবদাস অবশেষে পার্ব্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, 'তুমি ভালই করেছ। আমার কাছে তুমি হয় ত সুখ পেতে না, কিন্তু তোমার এই দেবদাদার অক্ষয় স্বর্গবাস ঘট্‌ত।'

ইহার পরে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পার্ব্বতীর বিবাহ হইল, এবং সে স্বামীর গৃহে চলিয়া গেল। তাহার স্বামী এক জন সচ্চরিত্র, বিচক্ষণ, সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক! বয়স চল্লিশের উপর। তাঁহার অনেকগুলি বড় বড় ছেলে মেয়ে। তিনি এই বয়সে বিবাহ করিয়া নিজেকে নিতান্ত অপরাধী জ্ঞান করিতেন। শয্যায় শুইতে আসিয়া প্রথম স্ত্রীর কথা মনে করিয়া চোখের জল মুছিতেন। তাঁহার রাজার সংসার। পার্ব্বতী অল্প দিনের মধ্যেই নিজের চরিত্রগুণে সেই ছেলেমেয়েদিগকে স্নেহে বশ করিয়া ফেলিল, এবং সংসারে রাজরাণীর মত প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল।

এদিকে দেবদাস কলিকাতায় গিয়া চুণীলাল নামক বিশৃঙ্খল-চরিত্র যুবকের সহিত মিশিয়া চন্দ্রমুখী নাম্নী এক বেশ্যার বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিল, এবং মদ ধরিল। সেই চন্দ্রমুখীকে সে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত, কিন্তু চন্দ্রমুখী তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। দেবদাসের পিতা মাতা তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সে কিছুতেই বিবাহ করিল না। পরে পিতার মৃত্যু হইলে দেবদাস বাড়ীতে আসিল। পার্ব্বতীও তখন পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। শ্রাদ্ধ শেষ হইলে সে দেবদাসের বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য ধর্ম্মদাসের নিকট তাহার চরিত্রকাহিনী সমস্ত অবগত হইল। তখন তাহার মনে হইল—'তাহার দেবদাদা এমন হইয়া যাইতেছে, এমন করিয়া নষ্ট হইতেছে, আর সে পরের সংসার ভাল করিবার জন্য বিব্রত! পরকে আপনার ভাবিয়া সে নিত্য অন্ন বিতরণ করিতেছে, আর তাহার সর্ব্বস্ব আজ অনাহারে মরিতেছে।' পার্ব্বতী সন্ধ্যার পরে দেবদাসের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। দেবদাস বলিল, 'দু'জনে মিলে মিশে একটা ছেলেমানুষি করে ফেলে—এই দেখ দেখি মাঝ থেকে কি গোলমাল হয়ে গেল। রাগ করে তুই যা ইচ্ছে তাই বললি, আমিও কপালের ওপরে ঐ দাগটা দিয়ে দিলাম।' পার্ব্বতী বলিল, 'দেবদাদা, ঐ দাগই আমার সান্ত্বনা, ঐ আমার সম্বল।' অবশেষে পার্ব্বতী দেবদাসকে বলিল, 'প্রতিজ্ঞা কর, আর মদ খাবে না।' দেবদাস কিছুতেই প্রতিজ্ঞা করিল না। পরে পার্ব্বতী মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া অনেক কান্না কাঁদিল। পরে বলিল, 'দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট,—আমি যে মরে যাচ্ছি।

কখনও তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার বাড়ী চল—আমার ছেলেবেলার সাধ—স্বর্গের ঠাকুর আমার এ সাধটী পূর্ণ করিয়া দাও—তার পরে মরি—তাতেও দুঃখ নাই।' দেবদাস তাহার পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—'আমাকে যত্ন করিলে যদি তোমার দুঃখ ঘুচে—আমি যাব।'

পার্ব্বতী স্বামিগৃহে ফিরিয়া গিয়া আবার তাহার সংসারধর্ম্মে মন দিল। বড় ছেলে মহেন্দ্রের বিবাহ দিয়া বৌ ঘরে আনিল। গরীব দুঃখীকে দান করিয়া, ঠাকুরবাড়ীর কাজ করিয়া, সাধুসন্ন্যাসীর সেবা করিয়া, অন্ধখঞ্জের পরিচর্য্যা করিয়া তাহার দিন কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আর পাঁচ বৎসর অতীত হইল। তাহার কোনও সন্তান হইল না। পুত্রবধূ ঘরে আনার পর তাহার কাজ অনেকটা কমিয়াছে, এখন তাহার ভাবনা কিছু বাড়িয়াছে। সে নৈরাশ্যের ভাবনা। সে কখনও কাজ করিয়া, মিষ্ট কথাবার্ত্তা কহিয়া, পরোপকার, সেবা শুশ্রূষা করিয়া সময় কাটায়; আবার কখনও সব ভুলিয়া ধ্যানমগ্না যোগিনীর মতও থাকে। এই সময়ে হঠাৎ তাহার বাল্যসখী মনোরমার এক চিঠি পাইল,—'দেবদাস নিতান্ত উচ্ছন্ন গিয়াছে। সে প্রায়ই কলিকাতায় থাকে, বাড়ী আসে কেবল টাকা লইতে আর তাহার দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিতে। এই সময়ের মধ্যেই নাকি তাহার অর্দ্ধেক বিষয় উড়াইয়া দিয়াছে। তাহার সে সোণার বর্ণ নাই, সে চেহারা নাই, দেখিলে ভয় হয়, ঘৃণা করে—' ইত্যাদি। এই চিঠি পাইয়া পার্ব্বতী দুইখানা পাল্কীতে বড় ছেলেকে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয়ে রওনা হইল। কিন্তু

সেখানে গিয়া দেবদাসের দেখা পাইল না। মনোরমা বলিল, 'পারু, দেবদাসকে দেখ্‌তে এসেছিলে?' পার্ব্বতী বলিল, 'না, সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলাম। এখানে তার আপনার লোক ত কেউ নেই।' মনোরমা অবাক হইয়া বলিল, 'বলিস কি? লজ্জা করতো না?' 'লজ্জা আবার কাকে? নিজের জিনিস নিজে নিয়ে যাব, তাতে লজ্জা কি?' 'ছিঃ ছিঃ—ও কি কথা? একটা সম্পর্ক পর্য্যন্ত নেই—অমন কথা মুখে এনো না।' পার্ব্বতী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'মনোদিদি, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যে কথা বুকের মাঝে বাসা করে আছে, এক আধবার তা' মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে। তুমি বোন, তাই এ কথা শুন্‌লে।'

পার্ব্বতীর এই পরপুরুষের প্রেমে তন্ময়তা কাব্যের হিসাবে খুব মর্ম্মস্পর্শী। ইহা সেই ব্রজগোপীগণের লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়া, পতিপুত্রাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হওয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। এক দিন চণ্ডীদাসও রামী রজকিনীর প্রতি এইরূপ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে 'পিতা মাতা' প্রভৃতি সম্বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ আরও কত স্ত্রীলোক সচরাচর দেখা যায়, যাহারা পতি-পুত্র ত্যাগ করিয়া পরপুরুষের সহিত বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহারা যে সমাজের কলঙ্ক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহাদের সেই প্রেমোন্মাদের সহিত পার্ব্বতীর এই প্রেমোন্মত্ততার প্রভেদ কোথায়? এক প্রভেদ এই, তাহাদের প্রেমোন্মত্ততার মানে কামোন্মত্ততা, পার্ব্বতীর প্রেম কামগন্ধহীন—তাহা রূপলালসা বা ভোগের লালসা অতিক্রম করিয়া সহজ

স্নেহের পদবীতে উঠিয়াছে। লোকে পিতা মাতা ভ্রাতাকে যেরূপ সহজভাবে স্নেহ করে, পার্ব্বতীও দেবদাসকে সেইরূপ বাল্যকাল হইতে স্নেহ করিতে শিখিয়াছে। সেই জন্য পার্ব্বতী দেবদাসের পতনের কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিল, 'তাহার দেব দাদা, এমন হইয়া যাইতেছে, এমন করিয়া নষ্ট হইতেছে, আর সে পরের সংসার ভাল করিবার জন্য বিব্রত!' পার্ব্বতী এখানে দেবদাসকে আপনার লোক ও স্বামীকে পর ভাবিতেছে। ইহা এক জন বিবাহিতা রমণীর মুখে নিতান্ত বিসদৃশ ও নিতান্ত বিগর্হিত শুনায়। কিন্তু যে এরূপ বলিতেছে, তাহার ইহাতে একটুও লজ্জা সরম নাই—কারণ, সে এই প্রেমের উন্মাদনায় লজ্জা ও ভয়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। পার্ব্বতীর প্রেম কামগন্ধহীন, সহজাত স্নেহের ন্যায় নির্ম্মল, স্বার্থলেশশূন্য, স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সেবা করিতে উন্মুখ।

৮

গ্রন্থকার পার্ব্বতীর পাশাপাশি আরও একটি নিঃস্বার্থ প্রেমের চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন; সে বারবণিতা চন্দ্রমুখীর প্রেম। কি শুভক্ষণে দেবদাসের সহিত চন্দ্রমুখীর দেখা হইল, সেই প্রথম দর্শনেই চন্দ্রমুখী আপনাকে ভুলিয়া দেবদাসের প্রতি আসক্ত হইল। অথচ দেবদাস তাহাকে ঘৃণা করে, দেবদাস তাহার দিকে ফিরিয়াও চায় না। দেবদাস তাহার বাড়ীতে যাতায়াত করে কেবল মদ খাইয়া নিজের দুঃখ ভুলিবার জন্য। সে চন্দ্রমুখীকে টাকা দেয়, কেবল খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া। অর্থ-রূপ-যৌবন-শালিনী চন্দ্রমুখী দেবদাসের জন্য পাগল হইয়া, তাহার নিজের

ব্যবসা তুলিয়া দিল, নিতান্ত দরিদ্র ভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। পরে দেবদাস তাহার প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে কিছু টাকা দিয়া এক নিভৃত পল্লীগ্রামে বাস করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে দেবদাসের ঘোরতর অধঃপতনের কথা শুনিয়া সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল এবং অনেক অনুসন্ধানের পর দেবদাসকে মাতাল হইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকা অবস্থায় তুলিয়া আনিয়া সেবা করিয়া বাঁচাইল। এই সময়ে দেবদাসের সহিত চন্দ্রমুখীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল। দেবদাস হঠাৎ গম্ভীর ভাবে চন্দ্রমুখীকে প্রশ্ন করিয়া বলিল 'আচ্ছা বৌ, তুমি আমার কে, যে এত প্রাণপণে আমার সেবা করচ?' চন্দ্রমুখী স্নেহজড়িত কণ্ঠে কহিল, 'তুমি আমার সর্ব্বস্ব—তা' কি আজও বুঝতে পারোনি?' দেবদাস দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, 'তা পেরেছি; কিন্তু তেমন আনন্দ পাই নে। পার্ব্বতীকে কত ভালবাসি, সে আমাকে কত ভালবাসে; কিন্তু তবু কি কষ্ট! অনেক দুঃখ পেয়ে ভেবেছিলাম, আর কখনও এসব ফাঁদে পা দেব না; ইচ্ছা ক'রেও দেই নি। কিন্তু তুমি এমন কেন ক'রলে? জোর করে আমাকে কেন বাঁধলে?' বলিয়া আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল—'বৌ তুমিও হয়ত পার্ব্বতীর মতই কষ্ট পাবে।' ইহার পরে একবার পার্ব্বতী, একবার চন্দ্রমুখী তাহার হৃদয়-মধ্যে বাস করিতে লাগিল। 'কখনও বা দুজনের মুখই পাশাপাশি তাহার হৃদয় পটে ভাসিয়া উঠিত—যেন উভয়ের কত ভাব।'

এখানে আমাদের মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়, এই দুইটি নারী

দেবদাসের মধ্যে এমন কি দেখিয়াছিল যে, তাহার জন্য এতদূর পাগল হইয়া যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিল? চন্দ্রমুখী এক দিন পার্ব্বতীর কথা উল্লেখ করিয়া দেবদাসকে বলিয়াছিল—'তুমি যে কি আকর্ষণ, তা' যে কখন তোমাকে ভাল বাসিয়াছে, সেই জানে। এই স্বর্গ থেকে ফিরে যাবে, এমন মেয়ে মানুষ কি পৃথিবীতে আছে?'—'তোমার রূপ আছে বটে; কিন্তু তাতে ভুল হয় না। এই তীব্র রুক্ষ রূপ সকলের চোখেও পড়ে না। কিন্তু যার পড়ে সে আর চোখ ফিরুতে পারে না।' দেবদাসের আকর্ষণ রূপের আকর্ষণ নহে—চন্দ্রমুখী মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার তেজে। তাহাকে দেবদাস নিতান্ত তেজের সহিত অবজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার যে রূপ যৌবন দেখিয়া কত শত লোকে ভুলিয়াছিল, দেবদাস তাহাতে ভুলিল না। চন্দ্রমুখী এখানে দেবদাসের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করিল যাহা সে এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও পুরুষের মধ্যে দেখে নাই। কিন্তু তাহার এই অসাধারণ তেজের মূল কোথায়, তাহাও চন্দ্রমুখীর বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। দেবদাস মাতাল অবস্থায় প্রায়ই পার্ব্বতীর কথা বলিত। তাহার কথা হইতে চন্দ্রমুখী দেবদাসের হৃদয়ের পরিচয় পাইল। সে বুঝিল, এই ব্যক্তি প্রেমের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে, ইহার হৃদয় খাঁটি সোনা।

পার্ব্বতীর পাশাপাশি চন্দ্রমুখীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়া গ্রন্থকার পার্ব্বতীর চরিত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে দেবদাসকে একবার মাত্র দেখিয়া বাজারের বারনারী পর্য্যন্ত আত্মবিস্মৃত হইতে পারে, তাহাকে আজন্ম দেখিয়া, আজন্ম তাহাকে ভাল বাসিয়া

পার্ব্বতী সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে পারিবে না কেন? যেন গ্রন্থকার আমাদিগকে বুঝাইতে চান ইহাতে পার্ব্বতীর কোনও দোষ নাই—পার্ব্বতী তাহার অসাধারণ প্রেমের বলে সাংসারিক ভালমন্দের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছে—যেমন এক দিন ব্রজবধূগণ করিয়াছিল।

আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পার্ব্বতীর লজ্জা নিন্দা ভয়ের সীমার অতীত এই অসাধারণ পরকীয় প্রেম কাব্য হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা অনিষ্টকর। সেই ব্রজবধূগণের প্রেমই কোন্ সমাজের হিসাবে ভাল? ব্রজগোপীগণের দোহাই দিয়া—ধর্ম্মের নামে সমাজে কত নেড়ানেড়ির উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং সমাজের হিসাবে পার্ব্বতীর এই পরকীয় প্রেম যে নিতান্ত গ্লানিজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পার্ব্বতীর দেবদাসকে আপন ভাবা ও নিজের স্বামীকে পর ভাবা সমাজে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পরপুরুষ-প্রেম-কলুষিত নারীর মনে একটা নজির হইয়া দাঁড়াইবে, কারণ, লেখকের আর্টের গুণে ইহা সকলেরই হৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক করিতে পারে। লেখক হয় ত বলিবেন, ইহা ত সমাজেরই দোষ। শৈবলিনী বলিয়াছিল, 'এক বোঁটায় যে দুটি ফুল ফুটিয়াছিল, তাহাদিগকে পৃথক করিলে কেন?' পার্ব্বতীও এই কথা বলিতে পারিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই শৈবলিনীরই অশেষবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া সতীধর্ম্মের মহিমা উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। শরৎবাবু পার্ব্বতীর সে প্রকার কোনও

প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন নাই। তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত অন্য ভাবে কিছু হইয়াছে। তাহা দেবদাসের অকাল ও শোচনীয় মৃত্যু দর্শন করিয়া জীবনব্যাপী দুঃখ।

এবার আমি শরৎবাবুর সৃষ্ট এই শ্রেণীর আর একটি পরকীয় প্রেমচিত্রের আলোচনা করিব। তাঁহার "স্বামী" পুস্তকে তিনি আর একটি পরপুরুষাসক্তা নারীর চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। সৌদামিনী বাল্যকালে তাহার মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত হয়। তাহার মামা একজন মস্ত পণ্ডিত-মূর্খ ছিলেন—অর্থাৎ, বই-পড়া বিদ্যা তাঁহার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান ছিলেন—যাহাকে ইংরেজীতে বলে agnostic। তিনি সেই সৌদামিনীকে নিজে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। সৌদামিনীও অনেক বই পড়িয়াছিল,—এমন কি, ইংরেজী দর্শনশাস্ত্র লইয়াও তর্ক করিতে পারিত, কিন্তু তাহারও সেই মামার ন্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। তাহার প্রতিবেশী এক জমিদারের পুত্র, নামটি তার নরেন, সৌদামিনীর মামার কাছে আসিয়া পড়িত এবং সৌদামিনীর সঙ্গে খুব তর্ক করিত। ক্রমে উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মিল। পরে যে দিন নরেন সৌদামিনীর 'পারের কাণ্ডারী' হইয়া তাহাকে কোলে করিয়া বৃষ্টির জলমগ্ন একটা নালা পার করিয়া দিল ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার 'ঠোঁট দুটোকে একেবারে পুড়িয়ে দিয়ে' সেই পারের মাশুল আদায় করিল, সেই দিন তাহাদের সেই গুপ্ত প্রেম চরমে উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহার বয়স পনেরো পার হইতে চলিল তবুও তাহার মামা তাহার বিবাহের নামও করেন না। অবশেষে তাহার মাতার

নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি একটি দোজবর পাত্র দেখিতে গেলেন—দেখিয়া তাঁর পছন্দ হইল। পাত্রটি পাশ-টাস তেমন কিছু করিতে পারে নাই, সৌদামিনী তাহাকে দুই বৎসর ইংরেজী পড়াইতে পারে, কিন্তু বড় নম্র, বড় বিনয়ী। ইতিমধ্যে মামার পরপারের ডাক পড়িল, তিনি মৃত্যুকালে এই সম্বন্ধই করিতে বলিয়া গেলেন। এ দিকে সৌদামিনী বিবাহের আশঙ্কায় নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইল। বাগানে একটা কাঁটালি চাঁপার কুঞ্জে বসিয়া নরেনের সহিত প্রেমালাপ করিতে করিতে তাহারা দুই জনে চোখের জলে ভাসিতে লাগিল। সৌদামিনী সারারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া ভাবিত নরেন ভিন্ন অপরের সঙ্গে তাহার বিবাহ কোনও ক্রমেই হইতে পারিবে না। যদি বাস্তবিকই এই দুর্ঘটনা ঘটে তবে বিবাহসভায় নিশ্চয়ই তাহার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত উঠিবে, এবং তাহাকে সেখান হইতে বিছানায় তুলিয়া নিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ কোনও ঘটনা ঘটিল না, বিবাহের পরে সে স্বামিগৃহে চলিয়া গেল। কিন্তু সৌদামিনীর মনে বড় দুঃখ রহিল, যাইবার সময় নরেনের সঙ্গে একটিবারও দেখা হইল না, নরেন কেন তাহাকে চাহিল না, সে খবরও পাওয়া গেল না।

শ্বশুর বাড়ীতে সৎ-শাশুড়ীর সংসার। তিনি তাহার নিজের ছেলে মেয়ে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, সৌদামিনীর স্বামী ঘনশ্যামের রোজগারের দ্বারা যদিও সংসার চলে, তবু কেহ সে বেচারীকে জিজ্ঞাসাও করে না। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সৌদামিনীর সুশিক্ষিত চিত্ত অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্রোহী হইয়া

উঠিল। সে বিদ্রোহ, স্বামীর প্রতি তাহার নিজের ভালবাসার জন্য নহে, স্বামীর প্রতি অবিচার হইতেছে দেখিয়া। কিন্তু ঘনশ্যাম গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও ধরার ন্যায় ক্ষমাশীল, কোনও প্রকার অত্যাচারেই তাঁহার রাগ হয় না। বরং তাঁহার নিজের খাওয়া পরা লইয়া তাঁহার বিমাতার সঙ্গে ঝগড়া করিতে স্ত্রীকে নিষেধ করিয়া দিলেন। সৌদামিনী শাশুড়ীর সঙ্গে স্বামীর অযত্নের জন্য ঝগড়া করিত বটে, কিন্তু শয়নগৃহে স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন না করিয়া খাটের নীচে একটা মাদুর পাতিয়া শুইত। ইহাতেও ঘনশ্যামের মনে কোনও বিকার জন্মে নাই। সৌদামিনী বরং এক দিন রাত্রে জাগিয়া দেখিল, স্বামী তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথা ধরার জন্য শুশ্রূষা করিতেছেন। যাহা হউক, শাশুড়ীর সঙ্গে স্বামীর পক্ষ হইয়া ঝগড়া করিতে করিতে আস্তে আস্তে সৌদামিনীর মনে স্বামীর প্রতি টান জন্মিতে লাগিল। ক্রমে স্বামীর বিছানায় শুইতেও তাহার মনে লোভ জন্মিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনও কথা বলিতে পারিত না। এক দিন সাজসজ্জা করিয়া স্বামীর পালঙ্কের উপর শুইয়াছিল, ঘনশ্যাম তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া দ্বিধা ও সঙ্কোচে নিজে অন্য ঘরে গিয়া শুইলেন। তখন সৌদামিনী মাটীতে পড়িয়া সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল।

যখন সৌদামিনীর চিত্ত স্বামীর দিকে এতটা অগ্রসর হইয়াছে তখন আর এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। উজ্জ্বল আকাশে উদিত ধূমকেতুর ন্যায় নরেন শিকারের ছল করিয়া তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সৌদামিনীর উপর তাহার অতিথি-

সৎকারের ভার পড়িলেও সে তাহার সম্মুখে বাহির হইল না। কিন্তু অপরাহ্ণে বেলা দুইটা আড়াইটার সময় যখন বাড়ী নিস্তব্ধ, সৌদামিনী তাহার ঘরের জানালার ধারে বসিয়া তাহার স্বামীর কুলুঙ্গী হইতে একখানা বৈষ্ণব গ্রন্থ লইয়া পড়িতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার আঁচলে টান পড়িল। চাহিয়া দেখিল নরেন নীচে জানালার বাহিরে বাগানে দাঁড়াইয়া আছে। সৌদামিনী বলিল, 'শিকার করিতে যাও নি কেন?' নরেন বলিল, 'তোমার স্বামী বৈষ্ণব মানুষ, তিনি এ বাড়ীতে আসিয়া জীবহত্যা করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।' এ কথা শুনিয়া সৌদামিনীর বুক স্বামিগর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল—সে মনে মনে ভাবিল, এ লোকটা দেখুক আমার স্বামী কত বড়। কিন্তু এ ভাব বেশীক্ষণ থাকিল না। নরেন গরাদের ফাঁক দিয়া খপ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল, টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল বলিয়া সে এতদিন তাহার খবর নিতে পারে নাই; সে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার মরণই ভাল ছিল; সে শুনিয়াছে যদিও সৌদামিনীর অন্যের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, তবুও সে তাহারই আছে; মুক্তা ঝি তাহাকে সব খবর দিয়া থাকে, নরেন যদি জানিত যে সদু সুখে আছে, তাহা হইলে সে মনে সান্ত্বনা পাইত, কিন্তু সে কোন্ সম্বল লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? 'এমন কোন্ সভ্য দেশ পৃথিবীতে আছে, যেখানে এত বড় অন্যায় হতে পারত?···কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে খুসী চলে যেতে না পারে?' ইত্যাদি—

সৌদামিনী সেই সয়তানের এই সকল মধুর হলাহল পান করিতে করিতে, তাহার মনে উল্টা স্রোত বহিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, মনে হইল যেন নরেন কোনও অদ্ভুত কৌশলে তাহার পাঁচ আঙ্গুলের ভিতর দিয়া পাঁচ শ বিদ্যুতের ধারা তাহার সর্ব্ব শরীরে বহাইয়া দিয়া পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত অবশ করিয়া আনিল।

এই সময়ে তাহার শাশুড়ী বারান্দার খোলা জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—'বউ মা, বলি, কথা কি তোমাদের শেষ হবে না বাছা?'…'বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সভ্য-ভব্য নয়, অমন ঝোপের মধ্যে দাঁড়াইয়া কান্না-কাটি করতে দেখলে হয় ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত সব দিক দেখতে শুনতে বেশ হ'ত।' এই ঘটনার পরে নরেন চম্পট দিল। সৌদামিনী ঘরের মেজের উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। সে দিন সে আর উঠিল না, কেহ তাহাকে ডাকিলও না। তাহার স্বামী যথাসময়ে বাড়ী আসিয়া তাঁহার বিমাতার মুখে সমস্ত শুনিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে একটুও বিকার লক্ষিত হইল না। বাড়ীর সকলের মুখ ঘোর অন্ধকার, পর দিন সৌদামিনী হেঁসেলে ঢুকিতে পারিল না। তাহার পরে মুক্তা ঝির দ্বারা নরেন এক পত্র পাঠাইল। সৌদামিনী তাহা পড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া জলে ভাসাইয়া দিল। সৌদামিনীর মাতার গৃহদাহ হইয়াছে, যে চিঠিতে এই সংবাদ লেখা ছিল, তাহা ঘনশ্যামের পকেটে হঠাৎ পাওয়া

গেল। সৌদামিনী মনে করিল, কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া তাহার স্বামী এই সংবাদ তাহার নিকট গোপন করিয়াছেন, তাহার নাস্তিক মামা দ্বারা কি এত বড় ক্ষুদ্রতা সম্ভবপর হইত? সৌদামিনী স্বামীকে এই প্রসঙ্গে অনেক স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিল। অবশেষে বলিল, 'বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছি বলেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে তিল তিল ক'রে মারবে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতেই দেব না, তা' নিশ্চয় জেনো। আমার মামার বাড়ীতে এখনো ত রান্নাঘরটা বাকী আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাবো। আমি কালই যাচ্ছি।'

ইহার পরে ঘনশ্যাম তাহার গহনাগুলা রাখিয়া যাইতে বলিলেন। সে বলিল, 'সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত বেশ, আমি রেখেই যাব।' ঘনশ্যাম বলিলেন, 'না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার টাকার বড় অনাটন।' অর্থাৎ সৌদামিনীর মার ঘর প্রস্তুত করিবার জন্য। কিন্তু তাহার কথা কে শোনে? সৌদামিনী ক্রোধ-ভরে তাহার সমস্ত গহনা, মূল্যবান কাপড়, জামা প্রভৃতি বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল। তাহার মন ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠিল —সে বাহিরে গিয়া অন্ধকার বারান্দায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পর দিন স্বামীর সঙ্গে দেখা হইল না, তিনি প্রায় সমস্ত গয়না নিয়ে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তিনি বাড়ীতে ফিরিলেন না। রাত্রি দুইটার সময় বাগানের দিকের জানালায় খট্‌খট্ শব্দ হইল, সৌদামিনী বুঝিল নরেন আসিয়াছে—মুক্তা খিড়কীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তখন

সৌদামিনী অবলীলাক্রমে সেই দরজা দিয়া বাহির হইয়া, বাগান পার হইয়া নরেনের গাড়ীতে গিয়া বসিল। নরেন তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া বৌবাজারে একটা ভাড়াটে বাড়ীতে রাখিল।

কথা আর বাড়াইব না, সেখানে গিয়া সৌদামিনীর মনে ঘোর অনুতাপ আরম্ভ হইল, সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য নরেনের নিকট অনেক কান্দাকাটী করিতে লাগিল। নরেন বলিল, 'আমি তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আস্‌তে পারি, কিন্তু তিনি কি তোমাকে ঘরে নেবেন?' সৌদামিনী বলিল, 'ঘরে নেবেন না সে জানি, কিন্তু তিনি যে আমাকে মাপ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। যত বড় অপরাধ হো'ক সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বলবার যো নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেচি, ভাই, আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এসো নরেন দা, ভগবান তোমাকে রাজ্যেশ্বর করবেন, আমি কায়মনে বলচি।'

নরেন এবার নিতান্ত ভাল মানুষটি হইয়াছে। কিন্তু সে দণ্ড-বিধির ৪৯৮ ধারার ভয়ে কিছুতেই নিজে যাইতে সম্মত হইল না। তবে কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই সৌদামিনীর সেই ক্ষমার অবতার স্বামী সেখানে নিজেই আসিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন।

এই পুস্তকখানির নাম 'স্বামী'। গ্রন্থকার স্বামীকে খুব বড় করিবার জন্য স্ত্রীকে ছোট করিয়াছেন। তবু সৌদামিনীকে প্রধান চরিত্র বলিতে হইবে, এবং লেখকের আর্টের গুণে সৌদামিনীর চরিত্র খুব ভাল ফুটিয়াছে। সৌদামিনী আমাদের সহানুভূতি

আকর্ষণ করে, তাহার অনুতপ্ত হৃদয়ের জন্য। গ্রন্থকার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার নিজের জ্বালাময়ী অনুশোচনার ভাষায় তাহার হৃদয়ের ছবি আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। সৌদামিনীর ন্যায় পার্ব্বতীকে কিন্তু একবারও অনুশোচনা করিতে দেখা যায় নাই। পার্ব্বতীও সৌদামিনীর ন্যায় এক জন দেবচরিত্র স্বামী পাইয়াছিল, কিন্তু পার্ব্বতী তাঁহাকে এক দিনের তরেও ভালবাসিতে চেষ্টা করে নাই, সে তাহাকে বরাবর পর ভাবিয়া আসিয়াছে আর পরপুরুষ দেবদাসকেই আপন ভাবিয়াছে। বৃদ্ধ ভুবনবাবুর কথা মনে পড়িলে পার্ব্বতীর কেবল হাসি পাইত, আর তাহার হৃদয়ের কান্না দেবদাসের জন্য মজুত করিয়া রাখিয়াছিল। অথচ লেখকের আর্টের জন্য আমরা পার্ব্বতীর দুঃখে দুঃখিত না হইয়া পারি না। পার্ব্বতীর জন্য আমাদের সহানুভূতি হয়, তাহার দুঃখ দেখিয়া—আর সৌদামিনীর জন্য আমাদের সহানুভূতি হয়, তাহার অনুতাপ দেখিয়া।

পার্ব্বতী ও দেবদাস, শৈবলিনী-প্রতাপের ন্যায় এক বৃন্তে দু'টি ফুলের মত প্রায় জন্ম হইতে ফুটিয়াছিল। ভাগ্য বিপর্য্যয়ে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া উভয়েই জীবনে ঘোরতর দুঃখ ভোগ করিল। কিন্তু সৌদামিনীর বেলায় এ কথা খাটে না। সৌদামিনী মামার যত্নে উত্তম রূপে আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। সে দর্শনশাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন লইয়া তর্ক করিতে পারিত, অথচ নিজের হিতাহিত বুঝিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যুবকগণ যে নিরীশ্বর শিক্ষা (godless education) পাইতেছে, তদ্দ্বারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের

বালিকাগণও যদি সেইরূপ শিক্ষা পাইয়া তাঁহাদের চরিত্র গঠন করিতে অসমর্থ হন, তবে তাঁহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া কত দূর সঙ্গত তাহা বিবেচনার বিষয় হইয়াছে। সৌদামিনী তাঁহার মামার নিকট এই godless education পাইয়াছিল, এবং নরেনের সঙ্গে অবাধে মিশিতে পাইয়া তাহার প্রতি অবৈধ প্রেমে আসক্ত হইল। এইরূপ অগঠিত-চরিত্র যুবক-যুবতীকে পরস্পরের সহিত অবাধে মিশিতে দেওয়া আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কতদূর সমীচীন তাহাও এ স্থানে বিবেচ্য। বাড়ীতে শাসন আলগা ছিল বলিয়াই নরেন সৌদামিনীর 'পারের কাণ্ডারী' হইয়া তাহার পারের মাশুল আদায় করিয়া লইতে পারিয়াছিল, এবং উভয়ে নিভৃত লতাকুঞ্জে মিলিত হইয়া প্রেমালাপ করিবার অবসর পাইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহার জন্য সৌদামিনীর সেই 'পণ্ডিত মূর্খ' মামাই দায়ী। সৌদামিনী তাহার মামার নিকট এইরূপ বিকৃত শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহার পরে স্বামিগৃহে গিয়া স্বামীর মহৎ চরিত্র দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে না হইতে, নরেন আসিয়া তাহার কাণে মধুর হলাহল ঢালিয়া দিল। নরেন তাহাদের বিচ্ছেদের কারণ সমাজের ঘাড়ে চাপাইয়া বলিল, 'তুমি ত জান আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়ে-মানুষকে বেঁধে রাখবার শেকল মাত্র। যেমন করে হোক্, আটকে রেখে তাদের সেবা নেবার ফন্দি। সতীর মহিমা কেবল মেয়ে মানুষের বেলা—পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি। আত্মা, আত্মা যে করে, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী

হবার জন্য ?···কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছা করলে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে খুসী চলে যেতে না পারে ?' ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এই সকল আপাতমনোরম সমাজদ্রোহীর যুক্তিতে সকলে ভুলিত না। কিন্তু সৌদামিনীর মন তাহার মামার শিক্ষায় এইরূপ যুক্তিতে ভুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং তাহার ফল হাতে হাতে ফলিল। এইরূপে আমরা দেখিলাম, সৌদামিনীর অধঃপতনের বীজ বাল্যকাল হইতেই তাহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়া কালক্রমে সুযোগ পাইয়া তাহা পল্লবপুষ্পে শোভিত হইয়া অবশেষে বিষময় ফল প্রসব করিল। গ্রন্থকার তাহাকে সেইরূপ অবস্থা-পরম্পরার মধ্যে স্থাপিত করিয়া, তাঁহার কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করিয়া তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু সৌদামিনী যতই অনুতাপ করিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক, তাহার অধঃপতনের ইতিহাস যে একটা অস্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার সৃষ্টি করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সমাজে পরকীয় প্রেমাসক্তা সৌদামিনীর সংখ্যা হয় ত বাড়িবে, কিন্তু দেব-চরিত্র ঘনশ্যামের সংখ্যা বেশী বাড়িবে বলিয়া বোধ হয় না।

এই স্থানে বর্ত্তমান সময়ের একটা প্রধান সামাজিক সমস্যার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সর্ব্বজনবিগর্হিত বরপণ-প্রথার জন্যই হউক, বা অন্য যে কারণে হউক, আমাদের সমাজে অনূঢ়া কন্যাদিগের বয়স ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। যাঁহারা ইয়ুরোপীয় আদর্শে আমাদের সমাজসংস্কার করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা

ইহাকে শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অধিক বয়সে মেয়ের বিবাহ দিলে যদি পার্ব্বতী ও সৌদামিনীর সৃষ্টি হয়—এবং তাহা যে কালক্রমে না হইবে এরূপ বলা যায় না—তবে ইউরোপীয় আদর্শটা আমাদের অবিচারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কিনা, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

৯

সধবার প্রেম (বিবাহের পরে জাত)।

এবার আমরা বিবাহিতা স্ত্রীর পরকীয় প্রেমাসক্তির বিষয়ে আলোচনা করিব। সৌভাগ্যের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার একখানা উপন্যাসেও এইরূপ প্রেমচিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত করেন নাই। হয় ত তাঁহার সময়ে art for art's sake এই নীতি fashionable হয় নাই; অথবা তিনি সমাজের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলিয়া এরূপ চিত্রাঙ্কনে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথই এইরূপ চিত্রের পথপ্রদর্শক। তাঁহার 'নষ্ট-নীড়' যখন 'ভারতী'তে বাহির হইত, তখন আমার এক সমালোচক বন্ধু বলিয়াছিলেন, এরূপ উপন্যাস আমাদের কন্যা বা ভগিনীদিগের হস্তে দেওয়া নিতান্ত অবৈধ। এই 'নষ্ট-নীড়ে' যাহার অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তাহার পূর্ণ বিকাশ। আবার রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট-নীড়' ও 'চোখের বালি'র একটা মিলিত সংস্করণ বাহির হইয়াছে—তাহার নাম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'চরিত্রহীন'।

নষ্ট-নীড়ের গল্পটি অতি ক্ষুদ্র। ভূপতি নামক এক কলিকাতাবাসী ধনী সুশিক্ষিত যুবকের ছেলেবেলা হইতে ইংরাজী লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার সথ ছিল। তিনি তাঁহার উকীল শ্যালক উমাপতির পরামর্শে এক খবরের কাগজ বাহির করিলেন। সেই সম্পাদকী নেশায় তাঁহাকে পাইয়া বসিল। এ দিকে তাঁহার সুশিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না স্ত্রী চারুলতার আর সময় কাটে না। ভূপতির অমল নামে একটি পিস্‌তুত ভাই তাহার আশ্রয় লইয়া কলেজে লেখা পড়া করিত। সে চারুলতার সঙ্গে সাহিত্য-সর্চ্চা করিয়া তাহার সময় কাটাইবার সহায়তা করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চা হইতে ঘনিষ্ঠতা, ও ঘনিষ্ঠতা হইতে স্নেহ, ও স্নেহ হইতে প্রেম জন্মিল। অমল মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে সে একজন বিখ্যাত লেখক হইয়া উঠিল। সে চারু-লতাকে তাহার লেখা পড়িয়া শুনাইত। যেখানে প্রেম সেইখানেই অভিমান—যখন চারুলতার প্রতি তাহার অভিমান হইত, তখন উমাপতির স্ত্রী মন্দাকিনীকে তাহার লেখা পড়িয়া শুনাইত, যদিও মন্দাকিনী তাহার রস গ্রহণ করিতে পারিত না। এইরূপে চারু ও মন্দার মধ্যে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল। অমলের দেখাদেখি চারুও গোপনে প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করিল। এক দিন অমল তাহার একটা লেখা কাড়িয়া লইয়া এক মাসিক পত্রিকায় বাহির করিয়া দিল। অন্য আর একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক চারুর এই লেখাটির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া ও অমলের লেখার নিন্দা করিয়া একটা সমালোচনা বাহির করিলেন। অমল তাহা প্রথমে চারু

যাহাতে দেখিতে না পায় সে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা ভূপতির হাতে পড়ায় ভূপতি চারুকে দেখাইয়া তাহার কত প্রশংসা করিলেন। অমল যখন ইহা জানিতে পারিল, তখন সে চারুর প্রতি অভিমান করিয়া মন্দাকিনীকে তাহার লেখা বেশী করিয়া শুনাইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে মন্দাকিনীর প্রতি চারুর ঈর্ষা বাড়িয়া উঠিল এবং মন্দাকিনীর সহিত অমলের চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছে, ভূপতির নিকট এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিল। ভূপতি কৌশলে মন্দাকিনীকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহার স্বামীও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভূপতির অনেকগুলি টাকা ভাঙ্গিয়া বিতাড়িত হইল। অমল চারুর সন্দেহের কারণ জানিতে পারিয়া চারুর প্রতি আরও রাগান্বিত হইল, এবং বর্দ্ধমানের এক উকীলের মেয়ের সঙ্গে যখন তাহার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইল, সে তৎক্ষণাৎ বিবাহে সম্মতি দিয়া, বিবাহান্তে বিলাত যাত্রা করিল। এ দিকে অমল চলিয়া গেলে চারু তাহার বিরহে নিতান্ত অধীর হইল। সে অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। ক্রমে এমনই হইয়া উঠিল, একান্তচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্ব্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। চারু গৃহকার্য্যের অবকাশে একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জ্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। সে উপুড় হইয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া অমলকে সম্বোধন করিয়া বলিত * * * 'অমল, অমল, তোমাকে আমি এক দিনও ভুলি

নাই, এক দিনও না—এক দণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সার ভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমায় পূজা করিব'।

'এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না, তাহার সমস্ত কর্ত্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালাসজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামীর বা পৃথিবীর আর কাহারও কোন অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম।' এ দিকে বাহিরে সে স্বামীকে একনিষ্ঠ হইয়া প্রীতি ও যত্ন করিতে লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত, চারু তখন ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের ধূলা সীমন্তে তুলিয়া লইত। সেবা শুশ্রূষা গৃহকর্ম্ম স্বামীর লেশমাত্র ইচ্ছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না।'

কিন্তু এই প্রবঞ্চনা বেশী দিন টিকিল না। চারু অমলের চিঠি পাওয়ার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু কোনও চিঠি আসিল না। চিঠি না আসাতে সমস্ত সংসার চারুর নিকট কণ্টক-শয্যা হইয়া উঠিল। চারু অবশেষে তাহার নিজের গহনা বন্ধক দিয়া অমলের নিকট বিলাতে এক reply prepaid টেলিগ্রাম করিল। 'আমি ভাল আছি।' তাহার এই সংক্ষিপ্ত উত্তর হঠাৎ ভূপতির হাতে পড়িল। তখন ভূপতির মনে সন্দেহের উদয় হইল। ক্রমে ভূপতি চারুর আচরণ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং আসল কথা বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না।

তখন যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, তাঁহার সংসর্গ ভূপতির নিকট নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। ভূপতি তখন চারুকে ত্যাগ করিয়া মহীশূরে চলিয়া গেল।

ভারতচন্দ্র অবিবাহিত প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের জন্য মাটীর তলে সুড়ঙ্গ কাটার কথা লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে বিবাহিত স্ত্রীর মনের মধ্যে পরপুরুষের ধ্যানের জন্য সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের পথ দেখাইয়াছেন। ভূপতি বেচারীর অপরাধ, সে তাহার খবরের কাগজ লইয়া সারাদিন ব্যস্ত থাকিত, চারুর সঙ্গে প্রেমালাপের অবসর পাইত না। ইহার পরে, যে সকল বড় বড় উকীল সারা দিনরাত্রি মক্কেলের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা সাবধান হইবেন। যে সকল ডাক্তার কবিরাজ সারাদিন রোগী দেখিয়া বেড়ান, স্নানাহারের অবসর পান না, তাঁহারা সাবধান হইবেন। যে সকল মুন্‌সেফ, সবজজ, ডেপুটী কাছারীতে সারাদিন কাটাইয়া রাত্রি জাগিয়া রায় লেখেন, তাঁহারা সাবধান হইবেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের যে সকল কেরাণী ভোরে উঠিয়া কোন ক্রমে ভাত নাকে মুখে গুঁজিয়া daily passenger হইয়া কলিকাতায় আফিস করিতে যান এবং রাত্রি ৯টা ১০টায় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আহার করিয়াই নিদ্রা যান, তাঁহারাও সাবধান হইবেন। কে জানে তাঁহাদের অন্তঃপুরে এইরূপ সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইতেছে কি না? আবার ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের বাসায় এক আধটি যুবক ছোট ভাই থাকে তাঁহারা আরও সাবধান হইবেন। আমাদের হিন্দুর গৃহে দেবর-ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধটা বড়ই মধুর সম্বন্ধ, স্বামীর ছোট ভাইকে

স্ত্রী নিজের ভাইয়ের মতই যত্ন করিয়া থাকেন এবং রহস্যালাপের মধ্যে তাঁহাদের পরস্পর-স্নেহ জমিয়া উঠে। বলা বাহুল্য, সেই স্নেহ পবিত্র, তাহাতে কিছুমাত্র মলিনতা নাই। কবিবর রবীন্দ্রনাথই প্রথমে সেই পবিত্র স্নেহের কিরূপ অপব্যবহার হইতে পারে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার অনুকরণকারীরা ইহার পরে অনেক দেবর-বৌঠা'নের সঙ্গে প্রেম ঘটাইয়াছেন ও ঘটাইতেছেন। এই সকল, সাহিত্য-সমাজ-শরীরে বিষের ন্যায় কার্য্য করিতেছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

চারুলতা তাহার স্বামীকে ভুলিয়া কেন অমলের সঙ্গে প্রেমে পড়িল? অমল চারুর জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকল ফুটাইয়া তুলিয়াছিল—এই কি তাহার একমাত্র কারণ? তাহা হইলে গৃহশিক্ষক মাত্রেই বয়স্থা বালিকার প্রেমের পাত্র হইতে পারে। আসল কথা, চারু অমলের সহিত ইচ্ছা করিয়া প্রেমের খেলা খেলিতে খেলিতে সেই খেলায় নিজকে সত্যিকার প্রেমের ফাঁদে ধরা দিল। লেখক চারুর প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, আমাদের সহানুভূতি স্বভাবতঃ ধাবিত হয় সেই গোবেচারা স্বামী ভূপতির দিকে। কবি স্কুল-মাষ্টারের স্থান অধিকার করিয়া নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য অবশ্য তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন নাই—তিনি আর্টের কারচুপি দেখানর জন্যই চারু-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—কিন্তু আমার মতে এখানে তাঁহার আর্ট নিষ্ফল হইয়াছে। লাভের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে একটি পাপচিত্র বাড়াইয়া সমাজের আবহাওয়া দূষিত করিয়াছেন।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস এই 'নষ্ট-নীড়ে'র রাজকীয় সংস্করণ (royal edition)। এই উপন্যাসে কবিবর art for art's sake এই নীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নিখিলেশের এক সাবেকি আমলের রাজার ঘরে জন্ম। তিনিই এ বংশে প্রথম রীতিমত লেখা পড়া শিখিয়া এম. এ. পাশ করেন। আবার তাঁহার স্ত্রী বিমলাকেও বিলাতী মেম রাখিয়া রীতিমত লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। নিখিলেশ মনে করিতেন স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের প্রেমের সম্বন্ধও সমান। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, স্ত্রীকে বাহিরে বের করেন। কিন্তু সংসারের কর্ত্রী তাঁহার পিতামহী যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন এ সম্বন্ধে বেশী উচ্চবাচ্য করিতে পারেন নাই। সংসারে বিমলার দুই বিধবা বড় জা ছিলেন—তাঁহার মধ্যে সকলের বড়টি জপ তপ ব্রত উপবাস লইয়া থাকিতেন, মধ্যমটির সে সব 'ভড়ং' ছিল না, বরং তাঁহার কথাবার্ত্তায়, হাসিঠাট্টায়, রসের বিকার ছিল। বিমলা প্রথমে স্বামীর ইচ্ছামত বাহিরে যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ঃ—

বিমলা বলিলেন—,—'বাইরেতে আমার দরকার কি ?' স্বামী বলিলেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাক্‌তে পারে—আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে

আমাদের দেনা পাওনা বাকী আছে।' বিমলা বলিলেন,—'কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হ'ল কোথায়?' স্বামী বলিলেন,—'এখানে আমাকে দিয়ে তোমার—সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েচ তাও জান না।'

অর্থাৎ, নিখিলেশের মতে তাঁহার স্ত্রী ঘরের বাহিরে গিয়া আর দশ জন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের যাচাই করিয়া যদি অবশেষে তাঁহার নিকটই আবার ফিরিয়া আসেন, তবেই তাঁহার সেই প্রেম খাঁটি প্রেম হইবে। তবে কথা এই, কৈমাছ পুকুরে তেমন বাড়িতেছে না মনে করিয়া তাহাকে যদি নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে সে আবার পুকুরে নাও ফিরিয়া আসিতে পারে। না আসে না আসুক, সে বাড়িবে ত। যাহা হউক, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—বাঙ্গলা দেশে তখন স্বদেশীর খুব ধুম পড়িয়াছিল। নিখিলেশের মনেও বিলক্ষণ দেশভক্তি ছিল। সেই কারণে তাঁহার এক স্বদেশ-সেবক বন্ধু সন্দীপ তাঁহাকে একেবারে পাইয়া বসিল। সে নিখিলেশের মাথায় হাত বুলাইয়া স্বদেশিকতা প্রচার করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের খরচও চালাইতে লাগিল। অবশেষে সে প্রচারকার্য্য উপলক্ষে নিখিলেশের বাড়ীতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল। সে এক বক্তৃতা করিয়া বিমলার শোণিতে আগুন ধরাইয়া দিল। বিমলা বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে চিকের বাহিরে মুখ বাহির করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার মনে হইল 'কাল পুরুষের নক্ষত্রের মত সন্দীপ বাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়িল। কিন্তু আমার হুঁস ছিল না। আমি কি তখন

রাজবাটীর বউ? আমি তখন বাংলা দেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি—আর তিনি বাংলা দেশের বীর!' বস্—অমনি কেল্লা ফতে হইয়া গেল। বিমলা সন্দীপকে নিজে উপস্থিত থাকিয়া খাওয়াইবার অভিপ্রায় স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। অবশ্য নিখিলও ইহাই চান। এই সূত্রে সন্দীপের সহিত বিমলার প্রত্যক্ষ-ভাবে আলাপ পরিচয় হইল। সন্দীপও সুযোগ বুঝিয়া তাহার কথার বুকুনি দিতে লাগিল। 'আজ আপনিই আমার কাছে দেশের রাণী। এ আগুন ত আমি কোনো পুরুষের মধ্যে দেখিনি। না, না, লজ্জা করবেন না—মিথ্যা লজ্জা সঙ্কোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মৌচাকের মক্ষিরাণী—আমরা আপনাকেই চারিদিকে ঘিরে কাজ করব—সেই কাজের শক্তি আপনারই—সেই কাজের কেন্দ্র আপনিই।' এই সকল চাটু-বাক্যের ফল অবশ্যই ফলিল। নিখিল বিমলাকে লইয়া দার্জ্জিলিঙ যাইতে চাহিল। বিমলা যাইতে স্বীকৃত হইল না। সন্দীপ কি প্রকৃতির লোক তাহা তাঁহার নিজের কথায়ই প্রকাশ পায়—'আমি যা চাই, তা আমি খুবই চাই। তা আমি দু হাতে ক'রে চটকাব, দুই পায়ে ক'রে দলব,—সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সঙ্কোচ নেই··· আমি যা চাই তা আমি সিঁদ কেটে নিতে চাই।' 'যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায়, সেইটেই হচ্ছে বীরের শক্তি'—ইত্যাদি। এই প্রকৃতির সন্দীপের সহিত দেশের কথা লইয়া বিমলার যতই পরামর্শ চলিতে লাগিল, ততই সে তাহার মায়াজালে হরিণীর মত

জড়াইয়া পড়িল। ক্রমে সন্দীপ তাহাকে বুঝাইতে লাগিল 'প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্ণ। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড় জানাটা মডারণ্ নয়।'—অবশেষে এক দিন সন্দীপের মনে হইল – 'বিমল যে আমার কামনার বিষয় হ'য়ে উঠেচে সে জন্যে আমার কোন মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌চি ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া। আমি জানি দু'বার তিনবার এমন এক একটা মুহূর্ত্ত এসেচে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধ'রে তা'কে আমার বুকের উপর টেনে আন্‌লে সে একটি কথা বল্‌তে পারত না; কিন্তু সময়টা ব'য়ে যেতে দিয়েচি।'

এ দিকে এসব দেখিয়া শুনিয়া নিখিলেশের মনে কাঁদুনি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তিনি কান্নাকে আমল দিতে চান না—'আর কিছু না—জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভাল। বিমল যদি তোমার না হয় ত সে তোমার নয়ই, যতই চাপাচাপি রাগারাগি করবে, ততই ঐ কথাটা আরো বড় করে প্রমাণ হবে। বুক ফেটে যায় যে—তা' যাক্।···বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তা' হ'লে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে আমি বিদায় হলুম—'

সন্দীপ এক দিন বিমলার কাছে তাহার স্বদেশী কার্য্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চাহিয়া বসিল। বিমলা তাহাকে না বলিতে পারিল না। কিন্তু এত টাকা কোথা হইতে দিবে? তাহার গয়না বিক্রয় করিয়া দিতে চাইল, সন্দীপ বলিল, সে হবে না, গয়না এখন

হাতে রাখিতে হইবে, তোমার স্বামীর টাকা থেকে দাও। যখন দেশের প্রয়োজন হয়েছে, তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি ক'রে রেখেছে। বন্দে মাতরং এই মন্ত্রে লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে। বল, বন্দে মাতরং—বিমলাও বলিল বন্দে মাতরং। কিন্তু সন্দীপ অবশেষে তাহার পঞ্চাশ হাজারের দাবী পাঁচ হাজারে কমাইয়া আনিল। মহিষমর্দ্দিনীর পূজার জন্য তাহার এই টাকার এখনই দরকার। তাহার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া বিমলাই সেই টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

কিন্তু সে এই পাঁচ হাজারও কোথায় পাইবে? তাহাদের শোবার ঘরের পাশে একটা ছোট কুঠরিতে লোহার সিন্দুকে নিখিল তাহার বড় ও মেজ ভাজের বাৎসরিক প্রণামীর জন্য ছয় হাজার টাকা মজুত রাখিয়াছিল। বিমলা নিখিলের পকেট হইতে সেই লোহার সিন্দুকের চাবি সংগ্রহ করিয়া সেই ছয় হাজার টাকার গিনি চুরী করিল এবং পর দিন তাহা সন্দীপের হাতে দিল। ইহাই বিমলার প্রেম-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি—অথবা তাহার স্বদেশ-সেবা-ব্রতের দক্ষিণা।

এই কার্য্য করার পর বিমলার মনে ঘোর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। অমূল্য নামে সন্দীপের একটি চেলা ছিল, সে বিমলাকে দিদি বলিয়া ডাকিত। বিমলা তাহাকে নিজের গহনার বাক্স দিয়া বলিল, যে রূপে হউক এই গহনা বিক্রয় করিয়া আমাকে ছয় হাজার টাকা কালই আনিয়া দেও। অমূল্য সেই গহনার বাক্স লইয়া তাহার তোরঙ্গের মধ্যে রাখিল, সে কিছুতেই গয়না বিক্রয় করিবে

না।' সে নিখিলের এক কাছারী লুট করিয়া ছয় হাজার টাকা আনিয়া বিমলাকে দিতে গিয়া দেখিল সন্দীপ সেই গয়নার বাক্স চুরী করিয়া আনিয়া বিমলাকে দিতেছে। সন্দীপ বলিল, 'মক্ষিরাণী, এ গয়না আজ আমি নেব ব'লে আসিনি—তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম। কিন্তু আমার জিনিষ যে তুমি অমূল্যর হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ করবার জন্যেই প্রথমে এ বাক্সে আমার দাবী তোমাকে স্পষ্ট ক'রে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার এই জিনিষ তোমাকে আমি দান করচি—এই রইল।' অমূল্য সেই ছয় হাজার টাকার নোট দিতে চাহিলে, বিমলা তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল —এ টাকা যেথান থেকে আনিয়াছ সেখানে রাখিয়া আইস। অমূল্য বলিল—সে বড় শক্ত কথা—সে প্রথমে সন্দীপের নিকট থেকে সেই গিনিগুলি ফেরত আনিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সন্দীপ তাহা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—অগত্যা তাহাকে অন্য উপায়ে এই ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইল—'দিদি তোমার কাছে এলুম বলেই ত ওকে চিন্‌তে পেরেছি—দিদি ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেচে—তুমিই ছুটিয়ে দিয়েচ'। বিমলা বলিল,—'ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েচে। কিন্তু অমূল্য এখনও বাকী আছে। শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালী মেখেচি সে ধুয়ে ফেল্‌তে হবে।'

সন্দীপ বিমলার সঙ্গে কথা কহিতেছে, এই সময়ে নিখিল আসিয়া সন্দীপকে বলিল, 'কাল কলকাতায় যাচ্ছি, তোমাকে যেতে হবে।' সন্দীপ বলিল, 'কেন বল দেখি, আমি কি তোমার

অনুচর নাকি?' 'আচ্ছা তুমিই কলকাতায় চল, আমিই তোমার অনুচর হব।' 'কলকাতায় আমার কাজ নেই।' 'সেই জন্যেই ত কলকাতা যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশী কাজ।' 'আমি ত নড়চিনে।' 'তা হ'লে তোমাকে নাড়াতে হবে।' 'জোর?' —'হাঁ জোর।'—'আচ্ছা বেশ নড়ব।' ইহার পরে সন্দীপ বিমলাকে সম্বোধন করিয়া এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়িল 'মক্ষিরাণী, আমি তোমাকে বন্দনা করি—আমি তোমারই বন্দনা করতে চল্লুম—তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্রবদল হয়ে গেচে—বন্দে মাতরং নয়, বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং—মা আমাদের রক্ষা করেন—প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন—বড় সুন্দর সে বিনাশ।··· মাতার দিন আজ নেই—প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া,—দেবতা স্বর্গ ধর্ম্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ করে দিয়েচ, পৃথিবীর আর সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া, নিয়ম সংযমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন' ইত্যাদি।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বিমলা আবার এই কথার ছটায় ভুলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, 'যাকে ছাই ব'লে দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেচে। এ একবারে খাঁটি আগুন তাতে কোন সন্দেহ নেই—আধ ঘণ্টা আগেই আমি মনে মনে ভাবছিলুম এই মানুষটাকে এক দিন রাজা ব'লে ভ্রম হয়েছিল বটে কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা, তা নয়—তা নয়—যাত্রার দলের পোষাকের মধ্যেও রাজা লুকিয়ে থেকে যায়—' ইত্যাদি।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নিখিল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া

থাকিয়া সন্দীপের এই প্রিয়ার বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। আর কেহ হইলে তখনই সন্দীপকে পদাঘাতে বিতাড়িত হইতে হইত।

যাহা হউক, সন্দীপ অবশেষে বিদায় নিতে নিতে বলিল, 'দেবী আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সব চেয়ে বড় হ'য়ে উঠল। দেবী আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম। আমার মাটীর মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না—এ মন্দির প্রত্যেক পলকে পলকে ভাঙ্গবে ভাঙ্গবে করছিল। আজ তোমার বড় মূর্ত্তিতে বড় মন্দিরে পূজা করতে চল্লুম।' বিমলা তাহার গয়নার বাক্স টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া ধরিয়া সন্দীপকে বলিল, 'আমার এই গয়না আমি তোমার হাতে দিয়ে যাকে দিলুম তার চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো'। নিখিল চুপ করিয়া রহিল, সন্দীপ বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

কিছু দিন হইতে বিমলার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্ত্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্বামী পৃথক ঘরে শুইতেন। সে দিন লোকজনকে খাওয়াইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। বিমলার ইচ্ছা হইল তাহার সেই জন্মতিথিতে স্বামীর পায়ের ধূলা সে লইবে। শোবার ঘরে গিয়া দেখিল স্বামী অকাতরে ঘুমাইতেছেন। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলিয়া তাহার পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখিল। পরে পশ্চিমের বারান্দায় গিয়া মাটীর উপর উপুড় হইয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিল, একটা কোনো দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো আশ্রয়, একটু ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে সব বুকেও

যাইতে পারে। মনে মনে বলিল, 'আমি দিন রাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাক্‌ব—প্রভু আমি খাবনা। আমি জল স্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্ব্বাদ এসে পৌঁছয়'। তাহার প্রার্থনা মিথ্যা হইল না। তাহার স্বামী শিয়রের কাছে আসিয়া বসিলেন, সে বুকের মধ্যে স্বামীর পা চাপিয়া ধরিল, তিনি আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

ইহার পরে বিমলার সেই সিন্ধুক হইতে ছয় হাজার টাকা চুরী ধরা পড়িল। সেই সিন্ধুকের চাবির খোঁজ হইতেই বিমলা আসিয়া নিখিলকে বলিল, 'চাবি আমার কাছে আছে, আমি চাবি দিয়া সিন্ধুক খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া নিয়া সন্দীপকে দিয়াছি।' কিসে খরচ করিয়াছে, তাহা বলিল না, নিখিলও তাহা জানিতে চাহিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে এই ছয় হাজার টাকার সহিত সেই ছয় হাজার টাকা ডাকাতির যে যোগ আছে, তাহা বুঝিতে পারিল। তখন নিখিলের মনে হইল—'বিমলা আমার নিকট হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ বিমলা যা' পারত তা' আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষয়িয়ে ফেলেচে। এই ছয় হাজার টাকা ওকে চুরি ক'রে নিতে হয়েছে—আমার সঙ্গেও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারে নি, কেন না ও বুঝেছে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। সরল মানুষকেও আমরা কপট ক'রে তুলি। আমরা সহধর্ম্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।' শোবার

ঘরে বিছানার উপর বসিয়া নিখিল এইরূপ ভাবিতেছিল—তখন বিমলা দরজার কাছে আসিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছিল। নিখিল তাহাকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে আনিতেই সে মেজের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নিখিল তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া নেবার চেষ্টা করিল। সে একটু জোরে হাত ছাড়াইয়া নিয়ে হাঁটু গেড়ে নিখিলের পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগিল। নিখিল পা সরিয়ে নিতেই সে তাহার পা জড়িয়ে ধরে বলিল, 'না, না, না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না—আমাকে পূজো করতে দিও।'

আখ্যায়িকা এখানেই একপ্রকার শেষ হইল। ইহার পরে যাহা আছে, তাহা আমাদের না শুনিলেও চলে। নিখিল কলিকাতায় যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় খবর আসিল স্বদেশী দলের বিরুদ্ধে মুসলমানের দল ক্ষেপিয়া উঠিয়া লুট পাট করিতেছে ও স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। নিখিল তাহা শুনিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া যুদ্ধ করিতে গেল, কাহারও বাধা মানিল না। রাত্রি দশটার সময় সে আহত হইয়া ফিরিল, সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যর মৃতদেহও আসিল।

রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসখানির অনেক অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাতে তাঁহার আর্টের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইয়াছেন, কেহ বা এটাকে একটা allegory (রূপক) মনে করিয়া ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আবার কেহ বা অনেক গালি দিয়াছেন। আমরা ভয়ে ভয়ে দুই চারিটি কথা

বলিব। আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টির একান্ত অভাব, নিতান্ত স্থূল দৃষ্টিতে, সাধারণ জ্ঞান হইতে যাহা বুঝিতে পারি, তাহাই বলিব।

(১০)

আর্ট স্বভাবের অবিকল নকল হইবে না—সত্য, কিন্তু আর্টকে স্বভাবের অনুগামী হইয়া চলিতে হইবে, নচেৎ কবির সৃষ্ট নরনারী কিম্ভূত-কিমাকার ধারণ করে। একজন চিত্রকর একটা মানুষের ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া যদি তাহার দুই হাতের পরিবর্ত্তে চারি হাত লাগান, তবে সে দেবতা হইবে—নয় দানব হইবে—মানুষ হইবে না। এই গ্রন্থে নিখিল, বিমলা ও সন্দীপ ইহার কেহই মানুষ হয় নাই। কবিশ্রেষ্ঠ মাঘ শিশুপালকে রাবণের অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এই সন্দীপও আমাদের নিকট সেই রাবণের একটি ক্ষুদ্র অবতার বলিয়া মনে হয়। হউক তাহাতে দোষ নাই—কিন্তু এতদূর পাশবতা, এতদূর নির্লজ্জতা, এতদূর কাপুরুষতা প্রকৃত মানুষে কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না,— সন্দীপ প্রকৃতই একটা দানব বা রাক্ষস। এই কারণেই কবিবর তাহার মুখ দিয়া সীতা দেবীর গ্লানিকর একটা কথা বাহির করিয়াছেন, যে জন্য অনেকে রবীন্দ্রনাথকে গালি দিয়াছেন। সন্দীপ বলিতেছে :—

"যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে' শ্রদ্ধা করি, সেও এমনি করেই মরেছিল। (অর্থাৎ নিঃসঙ্কোচে বল-প্রকাশ না করে) সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোক বনে

রেখেছিল—অতএব বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সঙ্কোচ ছিল, তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সঙ্কোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে বরত।”—

এই শেষ কথাটি নকল করিতে করিতে আমার চিত্ত শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জাতীয় সংস্কার হইতে এত দূর মুক্ত হইয়াছেন যে, অবলীলাক্রমে তাঁহার নিজের মনে এইরূপ ভাবের কল্পনা করিয়া কলম দিয়া তাহা লিখিয়াছেন। কবিকে অবশ্যই ভালমন্দ সব বিষয়ের কল্পনা করিয়া লিখিতে হয়। তিনি সন্দীপের যে চরিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, তাহার মুখে অবশ্য এ কথা খুবই মানায়*—কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি কাব্যের মধ্যে কবির নিজের ছাপও কিছু কিছু পড়ে, তাহা না হইলে চিত্র কেবল ফটোগ্রাফ হইয়া দাঁড়ায়। মাইকেল নাকি তাঁহার মেঘনাদবধে রাম ও লক্ষ্মণকে নিতান্ত হীন করিয়া আমাদের জাতীয় গৌরব নষ্ট করিয়াছেন। এই জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই মাইকেলকে এইরূপ ভাবে দূষিয়াছেন “মহৎ চরিত্র যদি বা নিজে সৃষ্টি করিতে না পারিলেন, তবে কবি

---

* কোনো গৃহস্থ নিতান্ত সর্ব্বস্বান্ত না হইলে “লক্ষ্মীর কৌটায়” পুরুষানুক্রমে রক্ষিত সুবর্ণমুদ্রা খরচ করিবার জন্য বাহির করে না। সাহিত্য সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ভাবরাজ্যে কি এতদূর দরিদ্র হইয়াছিলেন? আবার কোনো ব্যক্তি নিতান্ত বিপদে না পড়িলে নিজের পিতা মাতার প্রতি কলঙ্কারোপ করে না। রবীন্দ্রনাথ এরূপ কোন্ বিপদে পড়িয়াছিলেন? তিনি বিশ্বকবি হইয়াছেন বলিয়া কি জাতীয় ভাবের কোন ধার ধারেন না?

কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন—"I despise Ram and his rabble"—সেটা বড় যশের কথা নহে। তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন।" আমরাও এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতে পারি, মাইকেল যে টুকু বাকী রাখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সন্দীপচরিত্রের মধ্য দিয়া, সীতার চরিত্র খর্ব্ব করিয়া তাহা শেষ করিয়া দিলেন। থা'ক সে কথা, সন্দীপ নিজেই রাবণের অবতার, কাজেই রাবণের সহিত তাহার যথার্থ সহানুভূতি আছে। সে সময় বুঝিয়া বিমলাকে হরণ করিল না কেন, সেজন্য অনুতাপ করিতেছে, কিন্তু নিখিলও মানুষ, সে কোন্ প্রাণে সন্দীপকে এইরূপ সুযোগ দিল? স্বয়ং রামচন্দ্র যিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত, তিনি পর্য্যন্ত রাবণকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না—নিখিল কোন্ প্রাণে স্বয়ং মধ্যস্থ হইয়া দিনের পর দিন বিমলার এই অধঃপতনের সাহায্য করিল? একজন এম, এ পাশ করা সুশিক্ষিত স্বামীর পক্ষে ইহা কি স্বাভাবিক? হয় ত স্ত্রীকে পরপুরুষের সঙ্গে মিশিতে দিয়া তাহার মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তোলার একটা খেয়াল তাহার মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছিল; কিন্তু নিখিল ত একেবারে পাগল হয় নাই, সে সন্দীপের সঙ্গে স্বদেশী ব্যাপার লইয়া যে সকল তর্ক করিয়াছে, তাহাতে তাহাকে ধীর-প্রকৃতির লোক বলিয়াইত মনে হয়, সেই নিখিল বিমলার অধঃ-পতনের সূচনায় তাহাকে থামাইল না কেন? কাপুরুষের মত নিজে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া না দিয়া একটু শক্ত কঠোর

হইয়া সন্দীপকে আগেই তাড়াইল না কেন? স্ত্রীর মধ্যে মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তোলাতে একটা theory—কোন্ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি সেই theory নিজের স্ত্রীর উপর experiment করিতে বসিয়া তাহাকে রাজরাণী হইতে পথের কাঙ্গালিনী করিতে পারে? যে সকল ডাক্তার ঔষধ লইয়া experiment করেন, তাঁহারা প্রায়ই ইতর প্রাণীর শরীরের উপরেই করিয়া থাকেন। সংসারে এরূপ মূর্খ কয় জন আছে যে, নিজের স্ত্রীর শরীরে রোগের সূচনা দেখিয়া তাহা ঔষধ প্রয়োগে বন্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া, রোগের হাতে স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিয়া তামাসা দেখে যে, তাহার স্ত্রীর শরীর রোগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার বল বাড়াইতে পারে কিনা? সুতরাং কবির এই যে idea, তাহা কখনও অনুভূতিমূলক নহে, ইহা আকাশ-কুসুমের মত কল্পনা। Tolstoy এর সেই আর্টের সংজ্ঞা অনুসারে এইরূপ আকাশকুসুম-কল্পনা প্রকৃত আর্ট নহে।

নিখিলের ন্যায় বিমলাও সুশিক্ষিতা রমণী। তাহার যেরূপ গভীর বিদ্যা, তাহাতে তাহার নিকট কি আমরা একটু সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞান—একটু common sense আশা করিতে পারি না? অবশ্য প্রবৃত্তির তাড়নায়—অনেকেই হিতাহিতজ্ঞান-বর্জ্জিত হয়—এমন কি common senseও সব সময়ে থাকে না। কিন্তু কবি তাহার মনের যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে সে প্রথম হইতেই ত উদ্দাম প্রবৃত্তির বশীভূত হয় নাই, প্রথম অবস্থায় ত তাহার ভালমন্দ, হিতাহিত-জ্ঞান ছিল। তবে তাহার মত শিক্ষিতা রমণী প্রথম হইতেই সন্দীপের চাটুবাক্যে কেন

আত্মহারা হইল? সন্দীপ যেই তাহাকে বলিল, "তুমি বঙ্গের রাণী; তুমি বঙ্গরমণীর একমাত্র প্রতিনিধি, তুমি দেবী" অমনি সে গলিয়া গেল কেন? কেবল গলিয়া যাওয়া নয়, তাহার স্বামীকে ভুলিয়া সন্দীপকে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল, এমন কি যখন সন্দীপকে মন্দ লোক বলিয়া বুঝিল, তখনও তাহার লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য নিজে চুরি পর্যান্ত করিল! অবশ্য এরূপ রমণীও দেখা যায়, যাহারা স্বামীর টাকা চুরি করিয়া লইয়া পরপুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বিমলার তুলনা হয় না। বিমলাকে কবি ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সন্দীপের কথার ছটায় মুগ্ধ (fascinated) হইয়া এতটা অধোগামী হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক বোধ হয়। সুতরাং বিমলার চরিত্রও আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব, এখানেও কবির আর্ট বিফল হইয়াছে।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, এই উপন্যাসের যে তিনটি প্রধান চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া কবি তাঁহার মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহার তিনটিই নিতান্ত অস্বাভাবিক। কাজেই তাহারা কেহই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। সন্দীপের ন্যায় অতি মানুষ (super-human) দানব লইয়া পুরাণ রচনা চলে, কিন্তু উপন্যাস রচনা ব্যর্থ হয়। সেই পুরাণের দেবতা হইবেন শীতলা, কারণ তাঁহার মধ্যে সংক্রামক রোগের বীজ লুক্কায়িত, এবং নিখিল হইতেছে তাঁহার বাহন। বিমলা সুশিক্ষিতা যুবতী হইয়াও নিতান্ত শিশু। শিশুকে রাস্তায় পাইয়া যদি কোন লোক তাহার

হাতের মোয়া কাড়িয়া লয়, তখন আমরা সেই শিশুর দোষ দিই না, দোষ দিই তাহার বাপ-মায়ের। সেই শিশুর কান্না দেখিয়া আমাদের দয়া হয় না, বরং তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার উপরে রাগ হয়।

কেহ হয় ত বলিলেন, এই উপন্যাসখানির কলা-কৌশল অতি সূক্ষ্ম। আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি লোকের বোধগম্য নহে। তাহা হইলে কেবল সেই কারণেই ইহাতে আর্টের অভাব বলিতে হইবে। কারণ টলষ্টয়ের সূত্র অনুসারে যে কাব্য অধিকাংশ পাঠকের মনে কবির হৃদয়ের অনুভূতি সংক্রামিত করিতে না পারে, তাহাতে যথার্থ আর্ট নাই। (A work of art that united every one, with the author and with one another would be perfect art)।

এই কাব্যে মানসিক ভাববিশ্লেষণের চূড়ান্ত ছড়াছড়ি, ইহার আখ্যায়িকা গ্রন্থকার নিজের কথায় ব্যক্ত না করিয়া পাত্রপাত্রীদের আত্মকথার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ক্রমাগত নিখিল, বিমলা ও সন্দীপের sick sentimentalism পাঠকের চিত্তে বিরক্তি উৎপাদন করে। সময় সময় তাহাদের পূতিগন্ধময় ভাবের বিশ্লেষণ দ্বারা পাঠকপাঠিকার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তখন মনে হয় যেন এই তিন ব্যক্তি তাহাদের পেটের নাড়ী ভুঁড়ি বাহির করিয়া ক্রমাগত চটকাইতেছে, এবং তাহার দুর্গন্ধে চতুর্দ্দিকের আব-হাওয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কবি অবশ্যই স্কুলমাষ্টারী করিতে বসেন নাই এবং তাঁহার নিকট আমরা কোন উচ্চ শিক্ষার আশা করি না। কিন্তু এই

পূতিগন্ধময় কাব্য রচনা করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু (moral atmosphere) কলুষিত করিবার তাঁহার কোন অধিকার আছে কিনা ইহাই সুধীগণের বিবেচ্য।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ যেটুকু বাকী রাখিয়াছিলেন, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহা শেষ করিয়াছেন। আমরা এবার তাঁহার "চরিত্রহীন" গ্রন্থ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ কি কুক্ষণেই লিখিয়াছিলেন—কবির কার্য্য স্কুল-মাষ্টারী নহে। আমার বোধ হয় তাঁহার এই নীতি অবলম্বন করিয়াই শরৎবাবু তাঁহার "চরিত্রহীন" উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইহাতে যেন কাব্যের স্কুলমাষ্টারদিগকে challenge করা হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" "নষ্ট নীড়" ও "ঘরে বাইরে" অপেক্ষা শরৎবাবুর "চরিত্রহীন" সমাজের পক্ষে অধিকতর অনিষ্ট-কর, কারণ শরৎবাবুর আর্ট অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী এবং তাঁহার লেখা অনেক বেশী popular; আবার এই চরিত্রহীনে আমরা রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট—বিনোদিনী, চারুলতা ও বিমলাকে এক সঙ্গে পাই। Congressএর "Omnibus Resolution"এর ন্যায় ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব চরিত্রহীন ও চরিত্রহীনাদিগের একটা বিরাট মিলনভূমি, অথবা তাহাদের একটা বড় মেলা।

এই বিশাল গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করা কঠিন, তাহার সামর্থ্যও আমার নাই। তবে অতি সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। উচ্চশিক্ষিত আদর্শ যুবক উপেন এই উপন্যাসের মেরুদণ্ড। অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক সতীশ তাঁহার চেলা, কিন্তু সে

কলিকাতায় পড়িতে গিয়া এক মেসের ঝি সাবিত্রীর প্রেমে পড়িল। সাবিত্রী বেশ্যার গৃহে বাস করিলেও তাহার চরিত্র কলুষিত হইতে দেয় নাই। সতীশের সঙ্গে সে প্রেমের খেলা খেলিত, কিন্তু ধরা ছোঁয়া দিত না। ক্রমে সতীশের প্রতি তাহার খাঁটি ভালবাসা জন্মিল। সে অনেক দুঃখ পাইয়া সতীশকে নিজের নিকট হইতে তফাতে রাখিল। সতীশ কিন্তু সে অন্যের প্রেমে আসক্ত মনে করিয়া তাহার জন্য পাগল হইল—এবং "বড় দিদির" সুরেন ও দেবদাসের ন্যায় হতাশ প্রণয়ীদের অনুকরণে মদ গাঁজা ইত্যাদি ধরিল। এ দিকে উপেনের এক বিলাত-ফেরত বন্ধু জ্যোতিষের ভগিনী বেথুনকলেজের ছাত্রী সরোজিনী সতীশের প্রেমে পড়িল। উপেনের আর এক বন্ধু হারাণ মাষ্টার মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া তাহাকে আহ্বান করিল। উপেন সতীশের সঙ্গে তাহাকে দেখিতে গেল, হারাণের স্ত্রী কিরণময়ী উপেনকে দেখিয়া তাহার প্রেমে পড়িল। কিরণময়ী যেমন সুশিক্ষিতা, তেমন চরিত্রহীনা। সে বিদ্বান্ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অনেক পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল, কিন্তু প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিতে শিখে নাই। স্বামী যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন সে পাশের ঘরে অনঙ্গ ডাক্তারের প্রেম-পিপাসা মিটাইত; তাহার শ্বাশুড়ীর নাকি ইহাতে ইঙ্গিত ছিল। এই ডাক্তারটি অবশ্য সন্দীপের ন্যায় কেবল বাক্যের দ্বারা প্রেম করিতেন না, তাঁহার তত্দূর শিক্ষাও ছিল না। তিনি কিরণময়ীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সংসারের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপেনকে দেখামাত্রই কিরণময়ীর

প্রেম নিতান্ত ইন্দ্রিয়লালসার স্থূলত্ব হইতে সূক্ষ্মত্বের দিকে 'প্রমোশন' পাইল। হারাণ মাষ্টার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে কিরণময়ীর সেবা পাইয়া মারা গেলেন, কিন্তু কিরণময়ী উপেন ও সতীশের সঙ্গে যথেষ্ট আত্মীয়তা করিয়া লইল। তাহারা কিন্তু তাহাকে আমল দিল না, তবে সতীশ তাহার স্নেহের ঠাকুরপো হইয়া উঠিল। সতীশ তখন আর এক জনের জন্য পাগল, কিরণময়ীর নিকট সে ঠাকুরপো হইয়াই রহিল। উপেন তাহার আশ্রিত দিবাকর নামক ছোক্‌রাকে কলেজে পড়িবার জন্য কিরণময়ীর কাছে আনিয়া রাখিল। তাহাকে কাছে পাইয়া কিরণময়ী সেই "নষ্ট নীড়ে"র চারুলতার মত ঠাকুরপো-সম্বন্ধ পাতাইয়া তাহার সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা ও প্রেমচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিল। এটা অবশ্য দুধের সাধ ঘোল দিয়া মিটানর মত। একদিন হঠাৎ স্বয়ং দুগ্ধ মহাশয় অর্থাৎ উপেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিরণময়ী তাঁহার ব্যবহারে যখন বুঝিল—সে বড় কঠিন ঠাঁই, তখন তাহার মনের মধ্যে প্রতিহিংসা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল এবং বিনোদিনী যেমন বেহারীর জন্য পাগল হইয়া মহেন্দ্রের স্কন্ধে চড়িয়া পশ্চিমে গিয়াছিল, কিরণময়ীও দিবাকরের সঙ্গে "বাহির" হইয়া পূর্ব্বদেশে অর্থাৎ আরাকান যাত্রা করিল। কিন্তু বিনোদিনী বাঘিনী হইলেও কিরণময়ীর সঙ্গে তুলনায় যেন একটি পোষা বিড়াল। কিরণময়ী উপেনের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে দিবাকরকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, এবং উভয়ে আরাকানের এক নীচ পল্লীতে প্রকাশ্যতঃ স্বামি-স্ত্রীভাবে বাস করিতে লাগিল। উপেনের আদেশে

সতীশ গিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে উদ্ধার করিয়া আনিল। এ দিকে উপেন পত্নীহারা হইয়া সংসারে উদাসীন এবং যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিরণময়ী শেষকালে উন্মাদ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু যদিও শেষ পর্য্যন্ত উপেনকে পোষাকীভাবে ভালবাসিত, তবু উপেনের মৃত্যুশয্যায়ও সে তাহার দর্শন পাইল না। ইহাই নাকি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সতীশ যখন মদ গাঁজা ও তান্ত্রিক সাধনায় নিতান্ত বিভোর হইয়া পড়িল, তখন সাবিত্রী আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার অপবিত্র দেহ সতীশকে দান করিতে সম্মত হইল না। সাবিত্রীর ও উপেনের একান্ত অনুরোধে সতীশ সেই বেথুনকলেজের ছাত্রী সরোজিনীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিল; কারণ সরোজিনী তাহাকে নিতান্ত চরিত্রহীন জানিয়াও ভালবাসিতে ক্ষান্ত হয় নাই। সাবিত্রী উপেনের বাসায় আসিয়া তাহাকে ভগিনীর ন্যায় শুশ্রূষা করিতে লাগিল, উপেন অল্প দিন পরেই সকলকে কাঁদাইয়া দেহত্যাগ করিল।

আখ্যায়িকার এই সংক্ষিপ্ত চুম্বক (outline) পড়িয়া কেহ তাহার প্রকৃত রস পাইবেন না। গ্রন্থকার তাঁহার প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাণ্ড পুস্তকে ইহাকে পল্লবিত করিয়া চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার লেখার গুণে এই চরিত্রহীন এবং চরিত্রহীনাদের মেলাও পাঠক-পাঠিকাকে আকর্ষণ না করিয়া পারে না। সেইজন্যই এইরূপ লেখা আরও বিশেষ বিপদ্-জনক। তবে অবশ্যই কিরণময়ীর চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে মনে ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া যায় না। কিন্তু এরূপ সমালোচকও

আছেন, যাঁহারা আর্টের হিসাবে কিরণময়ীকে প্রশংসা করিয়াছেন। এই পাপ-পঙ্কিল আর্ট আমাদের মাথায় থাকুক; যে আর্টের দ্বারা সমাজের আবহাওয়া দূষিত হয়, পাঠক-পাঠিকার মনে কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করে—আমরা সে আর্ট চাই না। আমরা এ পর্য্যন্ত যত কলুষিত নারীচরিত্র সাহিত্যে পাইয়াছি, কিরণময়ী তাহার সকলের উপরে টেক্কা দিয়াছে। তাহার অসাধারণ প্রতিভা ও ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন শিক্ষা তাহার কুপথগমনের সাহায্য করিয়াছিল। সে এতকাল স্বামিসঙ্গ লাভ করিয়াও স্বামীকে ভালবাসিতে শেখে নাই, কেবল ছাত্রীর ন্যায় তাঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। অথচ পুরুষকে বশ করিবার ছলাকলা ও চাতুরী সে বিলক্ষণ জানিত। সেই স্বামী যখন রোগশয্যায় পতিত, তখন সে পরপুরুষের প্রেম-লাভের জন্য লালায়িত। অবশ্য স্বামী যখন অন্তিমশয্যায়, তখন অল্প কয়েকদিনের জন্য সে স্বামীকে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। এ বিষয়ে উপেনের স্ত্রী সুরবালাই নাকি তাহার গুরু। কিন্তু সুরবালার সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বে কি কখনও সে সতী নারীর কথা কোন কাব্যে বা ইতিহাসে পাঠ করে নাই? সে সকল পড়িয়া সে যাহা শিখে নাই, দুই দিন সুরবালাকে দেখিয়া বা তাহার কথা সতীশের মুখে শুনিয়া এতকাল পরে সে পতিপ্রেম শিক্ষা করিল কিরূপে? যাহা হউক, স্বামীর প্রতি সে প্রেমও সে আবার ঝাড়িয়া ফেলিল, এবং পুনরায় পরকীয় প্রেমের জন্য লালায়িত হইল। সেই প্রেমও একজনে সীমাবদ্ধ থাকিল না—প্রথমে সেই প্রেম অনঙ্গ ডাক্তারের প্রতি ছিল, পরে উপেনের ও সতীশের প্রতি, অবশেষে দিবাকরের

প্রতি—অথবা এক সঙ্গেই উপেন এবং দিবাকরের প্রতি ধাবিত হইল। উপেন তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিলে, উপেনকে শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায়ে সে বাঘের মত দিবাকরকে মুখে করিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। আরাকানের পথে জাহাজে তাহার সঙ্গে যে ভাবে কাটাইল, তাহা লিখিতে লেখনী কলঙ্কিত হয়। এইরূপ চরিত্রের বিকাশ দেখাইতে গিয়া লেখকের কল্পনা যেমন কলুষিত হয়, আবার পাঠকের চিত্তও সঙ্গে সঙ্গে কলুষিত হয়। এত বড় পাপচিত্রের সংসর্গে পাঠকপাঠিকার মনে বীভৎস রস ভিন্ন অন্য রসের সঞ্চার হইতেই পারে না। বীভৎস রসেরও অবশ্য কাব্যে স্থান আছে; কিন্তু তাহা অন্য উৎকৃষ্ট রসের অধীন হইয়া থাকে—অন্য রসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কাব্যের অধিকাংশ ভাগ জুড়িয়া বসে না।

কিরণময়ী প্রকাশ্যভাবে বেশ্যা না হইয়াও বেশ্যার অধম। সাবিত্রী প্রকাশ্যভাবে বেশ্যার গৃহে বাস করিলেও সে প্রকৃত বেশ্যা নহে। সে নানা প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও নিজের চরিত্র ঠিক রাখিয়াছিল।

সতীশের সঙ্গে তাহার যে প্রেমের খেলা চলিত, তাহাতে সতীশকে সে ধরা-ছোঁয়া দেয় নাই। অথচ সেবা দ্বারা তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অনেকটা চন্দ্রমুখী ও দেবদাসের মত। সে সতীশের যথার্থ হিতৈষিণী ছিল, সে জন্য সতীশকে আপনা হইতে দূরে রাখিয়া নিজে কত দুঃখ ভোগ করিয়াছে। সতীশ অবশ্য তাহাকে ভুল বুঝিয়া পাগলের মত হইয়াছিল; অবশেষে

সতীশ তাহার প্রেমে হতাশ হইয়া যখন নিজের সর্ব্বনাশ করিতে বসিল, তখন সাবিত্রীই আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিল ও তাহার বিবাহ দিল। সাবিত্রীর ভালবাসা, দেবদাসের প্রতি চন্দ্রমুখীর ভালবাসার ন্যায় স্নেহের পবিত্র সীমায় উঠিয়াছিল। সাবিত্রী সতীশের জন্য যেরূপ দুঃখভোগ করিয়াছে, তাহা পড়িতে পড়িতে আমাদের চোখে জল আসে। কিন্তু তাহা হইলেও সাবিত্রী-চরিত্র সমাজ-শরীরে বিষের কার্য্য করিবে। ইহার পরে যদি 'মেসে'র ছেলেরা সুন্দরী যুবতী চাকরাণীর সঙ্গে প্রেম করিতে যায়—তবে এই সাবিত্রীর জন্মদাতা সে জন্য দায়ী হইবেন। অধিকাংশ 'মেসে'র ঝি অবশ্য সাবিত্রী নহে, সুতরাং সতীশের অনুকরণে ঝির সঙ্গে প্রেম করিতে গেলে কত কত ছেলের যে পরকাল নষ্ট হইবে, তাহা বিচিত্র কি ? অন্ততঃ 'মেসে' এই সকল চরিত্র লইয়া যে আলোচনা ও 'এয়ারকি' চলিবে, তাহা-দ্বারা ছাত্রনিবাসের আবহাওয়া দূষিত হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সতীশ অবশ্য এই উপন্যাসের নায়ক,—সেই "চরিত্রহীন"। গ্রন্থকার পুস্তকের নাম "চরিত্রহীন" রাখিয়া সচ্চরিত্র লোকদিগকে যেন challenge করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ তোমরা যাহাকে চরিত্রহীন বলিয়া ঘৃণা কর, তাহার হৃদয় কত মহৎ—সেও প্রেমের জন্য কিনা করিতে পারে দেখ। কিন্তু প্রেমের জন্য স্বার্থত্যাগ অর্থাৎ সংসারে উদাসীন হইয়া ভ্রমণ, মদ গাঁজা খাওয়া, ইত্যাদি গ্রন্থকারের লেখায় নূতন নহে। তাঁহার সতীশ "বড় দিদি" গ্রন্থের সুরেন ও দেবদাসের পুনরাবৃত্তি বলিয়া বোধ হয়। আর প্রেমে হতাশ হইলেই

কি উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র হইয়া বেড়াইতে হইবে? হতাশ-প্রণয়ীর সংযত-চরিত্র হইয়া থাকাটা কি শরৎবাবুর অলঙ্কারশাস্ত্রে একটা দোষ বলিয়া গণ্য? উপেন আদর্শচরিত্র যুবক। উপেন কিরণময়ীর কুহক হইতে নিজেকে বাঁচাইয়াছে। কিন্তু তবুও যেন সন্দেহ হয়, তাহার মনে একটু কালো দাগ লাগিয়াছিল; নতুবা সে নিজে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ হইয়াও এবং কিরণময়ীর সবিশেষ পরিচয় পাইয়াও দিবাকরকে কিরণময়ীর হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহার সহিত একটা সম্বন্ধ ঠিক রাখিল কেন? তাহার অথবা দিবাকরের সংস্পর্শে আসিয়া কিরণময়ী ক্রমে ভালর দিকে যাইবে, উপেনের মত বুদ্ধিমান্ লোকের কি এই আশা নিতান্ত দুরাশা নহে? উপেনের স্ত্রীকে গ্রন্থকার স্বামিগতপ্রাণ করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া পাঠকের চোখে জল আসে না।

জ্যোতিষ ব্যারিষ্টারের উচ্চশিক্ষিতা ভগিনী কোন্ গুণ দেখিয়া সতীশের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হইল? সতীশের হৃদয় পরদুঃখে কাতর, আর তাহার মধ্যে সরল আন্তরিকতা (sincerity) যথেষ্ট ছিল, সে প্রাণ দিয়া অন্যকে ভাল বাসিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলেও একজন ইংরাজীশিক্ষিতা রমণী যখন সতীশের সাবিত্রীর জন্য প্রেমোন্মত্ততা জানিতে পারিল, তখনও তাহাকে ভাল বাসিবে কেন? বাস্তব জীবনে কয়জন উচ্চ শিক্ষিতা রমণী এরূপ পারেন? বোধ হয় লেখকের এখানেও সেই একমাত্র মামুলি কৈফিয়ৎ—"Love is ever blind."

(১১)

গণিকার প্রেম।

এবার আমরা বঙ্গ-সাহিত্যে বারবনিতার প্রেমসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীর চরিত্র আলোচনার পরে বারবনিতার প্রেমের আলোচনাতে আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন হইবে না। কারণ কিরণময়ীকে গৃহস্থ নারী ও বারনারীর মধ্যবর্ত্তী সেতু মনে করা যাইতে পারে।

বারনারীর প্রেম সাহিত্যে কতটা প্রসার লাভ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "গণিকাতন্ত্র সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধটি গত ১৩২৬ সনের শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনের "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। তাঁহার অগাধ অধ্যায়নের ফলে তিনি এই প্রকার সাহিত্যের এক বিস্তৃত তালিকা দিয়া তাহাকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের অন্তর্গত—পতিতা নারী কোন মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়া অথবা হরিভক্তি লাভ করিয়া কিরূপে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস। যেমন হরিদাস ঠাকুরকে মজাইতে আসিয়া হীরানাম্নী এক বেশ্যার উদ্ধার হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যকে সাহিত্যের ওস্তাদগণ "realism in art" এই নাম দিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাহিত্যে "বেশ্যার হাব ভাব, ছলাকলা, চাতুরী, কপটতা, ভালবাসার ভাণ, নীচতা, অর্থলোভ,

আমোদ-প্রমোদ, বিলাসলালসা প্রবৃত্তির,—এক কথায় বেশ্যার জঘন্য জীবন-যাত্রার চিত্র রং ফলাইয়া অঙ্কিত করা হইতেছে।" নারায়ণে প্রকাশিত "কমলের দুঃখ" গল্পে হেনা চরিত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যে পতিতার প্রেমের প্রভাবে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অঙ্কিত হইয়াছে—যেমন দেবদাসের প্রেমে পড়িয়া চন্দ্রমুখীর পরিবর্ত্তন। চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্যে পতিতা নারী পতিতা হইলেও সে নারীর বিশিষ্টতা একেবারে হারায় না, মন্দ'র ভিতরেও ভাল বীজ থাকে, এক শুভ মুহূর্ত্তে অনুকূল অবস্থা পাইয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া সেই পতিতা নারীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত করে, ইহাকে romantic movement তথা humanitarianismএর ফল বলা যাইতে পারে।

এই চারি শ্রেণীর সাহিত্যসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ললিত বাবু যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, মোটের উপর তাঁহার সঙ্গে আমাদের সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ধর্ম্মসাহিত্যের অন্তর্গত হইয়াছে, তাহাতে বারবিলাসিনীর চিত্র মহাপুরুষের চিত্রের পাশে অতি সঙ্কুচিত হইয়া আছে। বরং "“মহাপুরুষের পবিত্রতা, উদারতা, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ পাপীয়সী কুলটাদিগের বিরোধিতায় (Contrast) উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠে।" দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য-সম্বন্ধে স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় প্রকার যুক্তির আলোচনা করিয়া ললিত বাবু বলেন—

"জগতে যাহা কিছু আছে, তাহাই যে কাব্যের বিষয়ীভূত হইবে, এমন কোন কথা নাই; প্রকৃত কবি বিষয়নির্ব্বাচনে বিচারশক্তির প্রয়োগ করিবেন, কোন্‌টা চিত্রপটের অন্তর্ভুক্ত করিবেন, কোন্‌টা

বাদ দিবেন,—কোন্‌টুকু রাখিবেন, কোন্‌টুকু ঢাকিবেন, এবিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিবেন। এইখানেই খাঁটি ও ঝুটা কবির প্রভেদ। মানবশরীরের নগ্নতা অশোভন, সাহিত্যেও নগ্নবস্তুতন্ত্রতা সেইরূপ অশোভন। অবশ্য আমরা পাপের চিত্র মাত্রকেই কাব্য-চিত্রশালা হইতে নির্ব্বাসিত করিবার রায় দিতেছি না। যে চিত্র-দর্শনে পাপের প্রতি ঘৃণা বা আতঙ্কের উদয় হয়—সে সব চিত্র পাপের চিত্র বলিয়াই বর্জ্জনীয় নহে। বরং তাহাতে পাপের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে বলিয়া তাহা উপকারী। কিন্তু যে সব চিত্রে উত্তেজক উন্মাদক উপাদান আছে, চিত্ত কলুষিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে সব চিত্র উদ্‌ঘাটন করা যুক্তিযুক্ত নহে। পরিণতবয়স্ক লোকে হয়ত এ সব চিত্র দর্শনে অবিচলিত থাকেন। কিন্তু অগঠিতচরিত্র যুবকযুবতী সকলেরই যে এরূপ সুবুদ্ধি হইবে, তাহা বলা যায় না।”

ইহার সঙ্গে আমি আর একটা কথা বলিতে চাই। পাপের চিত্রদর্শনে যে ঘৃণা ও আতঙ্কের উদয় হয়, তাহা আবার ক্রমাগত পাপের চিত্র দেখিতে দেখিতে পাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা (familiarity) জন্মিলে থাকে না। যেমন দেবদাস প্রথম দিন চন্দ্রমুখীর বাড়ীতে গিয়া যেরূপ ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়াছিল, পরে সেখানে যাইতে যাইতে তাহার আর সে ঘৃণা থাকিল না—সেই চন্দ্রমুখীর বাড়ীই তাহার একটা আড্ডা হইয়া উঠিল। সুতরাং সৎ-সাহিত্য মধ্যে পাপের চিত্র, যে কারণেই হউক, উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা সমাজের পক্ষে নিতান্ত দূষণীয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বারবনিতাসংশ্লিষ্ট সাহিত্য-সম্বন্ধেও একথা খাটে।

বেশ্যার মধ্যে সুষুপ্ত নারীত্ব বা মানবিকতা ফুটাইয়া তোলা খুব ভাল কথা সন্দেহ নাই। যে বেশ্যা সে যে চিরদিনই বেশ্যা থাকিবে, কখনও ভাল হইতে পারিবে না—তাহার কোন কথা নাই। কিন্তু একটি বেশ্যাকে ভাল করিতে গিয়া লেখক যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে আর দশটি সতীরমণী বা সচ্চরিত্র যুবককে পাপপথে টানিয়া নামান, তবে তাঁহার সেই সমাজহিতৈষণা থাকিল কোথায়? দুঃখের বিষয়, এই গণিকাতন্ত্র-সাহিত্য-রচয়িতা কবিগণ সব সময়ে একথা মনে রাখেন না। এই জন্যই তাঁহাদের রচিত এই প্রকার সাহিত্য দ্বারা সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়। আর বড়ই দুঃখের বিষয়, বঙ্গসাহিত্যে এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রসার দিন দিন বাড়িতেছে। তাহার প্রধান কারণ বেশ্যার উপকার সাধন নহে, লেখকের নবেল লেখার সাধ—তাঁহাকে নবেল লেখার জন্য প্রেমের চিত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—তাহা বেশ্যা-পল্লীতেই যেন আজকাল কতকটা সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। নারায়ণ-পত্রিকায় প্রথম যখন "ডালিম", "মরণে জয়", "হাসির দাম" "প্রাণ-প্রতিষ্ঠা", "বিভাকর" প্রভৃতি গল্প বাহির হইত, তখন মনে করিতাম—নারায়ণের পূজার জন্য দেশমান্য সম্পাদক এই সকল গোময় ও গোমূত্রের আয়োজন করিয়াছেন। তখন উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু ললিতবাবু তাঁহার প্রবন্ধে এই শ্রেণীর সাহিত্যের যে প্রকাণ্ড তালিকা দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বাস্তবিকই ভয় হয়।

ললিতবাবু প্রবন্ধশেষে বলিয়াছেন—বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের এইদিকে একটা ঝোঁক (tendency) দেখা যাইতেছে—এমন কি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রভৃতি চিন্তাশীল প্রবীণ ব্যক্তিগণও এই পথ ধরিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের চেলারা যে তাঁহাদের অনুগামী হইবেন, তাহা একেবারেই বিচিত্র নহে। এই জন্য এই শ্রেণীর গল্পের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইতেছে। ওস্তাদগণ অবশ্য মহৎ উদ্দেশ্যেই এই সব লিখিতেছেন, এবং তাঁহারা কতকটা ওজন ঠিক রাখিয়া লিখিতে পারেন—কিন্তু চেলাগণকে সামলান অত্যন্ত কঠিন। আজকাল বঙ্গ-সাহিত্য পাপ চিত্রের প্রসারে ভারাক্রান্ত হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতেছে। ভগবান্ বাঙ্গালীর অতি সাধের ধন, সাধনার বস্তু বঙ্গসাহিত্যকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

(১২)

কয়েকটা গোড়ার কথা।

আমরা বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম ও গণিকার প্রেমের প্রসঙ্গ এক প্রকার শেষ করিলাম। এখন এই সম্বন্ধে কয়েকটি গোড়ার কথার আলোচনা করিব। প্রথম কথা এই—সধবা ও বিধবার পরপুরুষাসক্তি কি সমাজে নাই? যাহা সমাজে আছে, অর্থাৎ যাহা সত্য ঘটনা, কবি যদি সেই সত্য অবলম্বনে তাঁহার আখ্যায়িকা রচনা করেন, তবে তাঁহাকে দোষ দিলে চলিবে কেন? আখ্যায়িকা যদি

সমাজের প্রকৃত চিত্র হয়, তবে তাহাতে সমাজের ভাল মন্দ দুইই থাকিবে। কবির আর্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্বীকার করি; সত্যকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করাই কবির কার্য্য। কিন্তু জগতে যাহা সত্য ও সুন্দর, তাহার সঙ্গে মঙ্গলেরও সম্বন্ধ আছে। কারণ জগৎ-স্রষ্টা যিনি, সত্য শিব সুন্দরই হইতেছে তাঁহার স্বরূপ। আর সৃষ্ট জগৎ তাঁহারই স্বরূপের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কবির সৃষ্টিও যদি সেই বিশ্বসৃষ্টির অনুকরণ করে, তবে তাহাতে আমরা সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শিব বা মঙ্গলকেও দেখিতে আশা করি। কবি কেবল সত্যকে সুন্দর করিয়া দেখালেই চলিবে না, তাহার সঙ্গে মঙ্গলও থাকা চাই। কেহ হয় ত বলিবেন, একজন ডাক্তার রোগীর মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই তাহার শরীরের ক্ষত অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া চিরিয়া বাহির করেন, এবং তাহার ফলে রোগী রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ হয়; কবিও সেইরূপ সমাজশরীরের সুস্থতাসম্পাদনের জন্যই সমাজের ক্ষত সকল ঢাকিয়া না রাখিয়া প্রকাশ করেন। ইহার উত্তরে আমি বলি, মানবশরীরের ক্ষত অস্ত্রচিকিৎসায় আরাম হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজশরীরের ক্ষত কখনও আরাম হইবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যসমাজে পাপ-পুণ্য একই ভাবে রহিয়াছে; কারণ যে তিনটি উপাদানে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তাহাদের সমষ্টিতে পাপ ও পুণ্য উভয়ই আছে। তবে কখনও পুণ্যের ভাগ বাড়ে, পাপের ভাগ কমে, কখনও বা পাপের ভাগ বাড়ে, পুণ্যের ভাগ কমে। পাপ-পুণ্যের মিশ্রণ যদি মনুষ্যজাতির স্বভাব হয়, তবে মনুষ্যসমাজের অস্ত্রচিকিৎসা বা যে কোন চিকিৎসাই

কর না কেন, তাহাকে কথনও পাপমুক্ত করিতে পারিবে না। বরং অনেক কুচিকিৎসক যেমন মনুষ্যশরীরে অস্ত্র করিয়া ক্ষত বাড়াইয়া নালিঘা করিয়া বসেন, এই সকল সমাজচিকিৎসকও তাঁহাদের আর্টের দ্বারা প্রলোভনময় পাপ-চিত্রকে অধিকতর মনোরম করিয়া সমাজের ক্ষত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। সমাজে বিনোদিনী, বিমলা বা কিরণময়ী অপেক্ষাও অনেক খারাপ লোক আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের কে খোঁজ রাখে? কবি তাঁহার আর্টের দ্বারা তাহাদের প্রলোভনময় পাপচিত্র অধিকতর প্রলোভনীয় করিয়া ধরাতে, তাহারা আমাদের পরিচিত হইয়াছে, এমন কি অনেকের অনুকরণীয়ও হইতে পারে। তবে, কবি কি পাপচিত্র তাঁহার কাব্য হইতে একেবারে বর্জ্জন করিবেন? তাহা কথনও সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে কাব্য অসম্পূর্ণ হইবে, এবং আলোকের পার্শ্বে আঁধার না ধরিলে, চিত্র ফুটিবে কেন? আলো ও আঁধারের কি পরিমাণে মেশামিশি হইলে কাব্য সার্থক হইবে, তাহা প্রকৃত কলাবিৎ কবির বোধগম্য, সেখানেই তাঁহার আর্টের প্রকৃত পরিচয়। কবি পুণ্যের আলোক ফুটাইবার জন্য যেমন তাহার পাশে পাপচিত্র অঙ্কিত করিবেন, সেইরূপ আবার পাপের দণ্ডবিধান করিয়া পুণ্যের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিবেন, কারণ ইহাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। এথানে আপত্তি হইতে পারে, এ সংসারে অনেক সময়ে অধর্ম্মেরইত জয় দেখা যায়, পাপীর দণ্ড সব সময়ে দেখা যায় না; সুতরাং কাব্যে তাহা দেখাইতে হইবে কেন? ইহার উত্তরে আমি বলি, আমরা এ সংসারে মনুষ্যের

জীবনের সবটুকু দেখিতে পাই না, অর্দ্ধাংশ দেখি মাত্র। তাহার মৃত্যুর পরে জীবনের অপরার্দ্ধ কিরূপে অতিবাহিত হয়, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। সুতরাং পাপীর যে দণ্ড হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বরং মহাপুরুষদের বাক্য ও শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তবে পাপের দণ্ড অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, ইহাই আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে। স্বভাবের (Nature) ঘটনা যাহা অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা সুন্দর সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়া দেখানই কবির কার্য্য। সুতরাং কবির সৃষ্টিতে আমরা জগতের হিতের জন্য নৈতিক জগতের (moral order of the universe) একটা সম্পূর্ণ চিত্রই দেখিতে আশা করি। জগতের মহাকবিগণও এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন, ইহার নাম Poetic justice।

কেহ বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া বলিবেন, Anatomy, Physiology, Biology প্রভৃতি বিজ্ঞান যেরূপ জীবদেহের সব অংশ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করে,—তাহার মধ্যে শ্লীলতা, অশ্লীলতা বলিয়া কোন কথা নাই—আজকাল এক শ্রেণীর কবি সমাজ-শরীরের ভাল মন্দ সব অংশই কাব্যকলার সাহায্যে তন্ন তন্ন করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেখান। ইহার নাম realism in art. বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের কার্য্য যদি দোষাবহ না হয়, তবে কবির দোষ কোথায়?

ইহার উত্তরে আমি বলি, শরীরবিজ্ঞানবিদের সহিত কবির অনেক পার্থক্য। শরীরবিজ্ঞানবিৎ মানবদেহের গোপনীয় অংশ যে ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখান, তাহাতে কাহারও মনে রিপুর

উত্তেজনা হয় না—কিন্তু কবি অথবা চিত্রকর নগ্ন মানবদেহ' বা সমাজকে তাঁহার শিল্পকলার সাহায্যে যেরূপ লোভনীয় করিয়া চিত্রিত করেন, তাহাতে সাধারণ নর-নারীর মনে কুভাবের উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। এই কারণে Reynolds, Zola প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাসলেখকের গ্রন্থ পাঠ করা অনেকে দোষাবহ মনে করেন। যদি কেহ সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া সমাজের কলঙ্ক প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কাব্যের সাহায্য না লইয়া অন্যবিধ রচনা দ্বারাও ত তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। বিজ্ঞানের ভাষা কাব্যের ভাষা নহে, বৈজ্ঞানিক কথনও তাঁহার বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের জন্য কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

আর একটি কথা হইতে পারে—প্রেম মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহার মধ্যে আবার বিধবা সধবা গণিকা কি? প্রত্যেক মানুষই তাহার স্বভাবসিদ্ধ শক্তি বা গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে অন্যের সংসর্গে আসিয়া ক্রমে সেই সকল গুণ বা শক্তির বিকাশের (development) দ্বারা তাহার মনুষ্যত্ব লাভ করে। প্রেম তাহার হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি, সেই প্রেম তাহাকে অন্যের সংসর্গে আনিয়া বা অন্যের সহিত বাঁধিয়া তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের সাহায্য করে। সুতরাং সেই প্রেমের সম্বন্ধ থর্ব্ব বা সীমাবদ্ধ করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব লাভের বাধা জন্মাইতে কাহারও অধিকার নাই। অর্থাৎ এক কথায়, individual (ব্যক্তি বিশেষের) পরিণতির উপরে society (সমাজের) হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। অন্য ভাবে বলিতে গেলে মন্ত্রপড়া

বিবাহটা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বাধা জন্মাইলে তাহাকে অগ্রাহ্য করাই উচিত। কোন কোন কবি এই ভাবে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়াছেন। "ঘরে বাইরের" নিখিলেশ এই ভাবে বিমলার সহিত নিজের মন্ত্র-পড়া বিবাহ সম্বন্ধ কতকটা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য পরপুরুষের সহিত তাহার মিলন ঘটাইয়াছেন। "স্বামীর" নায়িকা সৌদামিনীকে নরেন এই অর্থে সৌদামিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত মন্ত্রপড়া বিবাহসম্বন্ধ লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া তাহার নিজের সঙ্গে বাহির হইয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিল। "দেবদাসের" পার্ব্বতীর আজীবন দুঃখও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত মন্ত্রপড়া বিবাহ হইতে সঞ্জাত। কবি যেন ইঙ্গিতে দেখাইতে চান, একজন নিরপরাধ নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য পুরুষের সঙ্গে মন্ত্র পড়িয়া বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন কষ্ট দিতে সমাজের কোন অধিকার নাই। আবার এই কবিই তাঁহার "শ্রীকান্ত" আখ্যায়িকায় এই কথাটা আর একটি চরিত্রের মধ্য দিয়া অধিকতর স্পষ্ট করিয়া খুব জোরের সহিত তুলিয়াছেন। অভয়া নাম্নী একটি যুবতী তাহার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া রোহিণী নামক পরপুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া স্বামীর উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনে গিয়াছিল; সেখানে শ্রীকান্তের চেষ্টায় তাহার স্বামীর সঙ্গে দেখা হইল বটে—কিন্তু সেই পাষণ্ড তখন এক বর্ম্মিজ রমণীকে লইয়া ঘর করিতেছিল, তাহার সুখের ঘরকন্নার মধ্যে অভয়া কেন আসিল বলিয়া সে অভয়াকে নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। তখন অভয়া সেই রোহিণীর বাসাতেই ফিরিয়া

আসিয়া তাহার সঙ্গে পূর্ব্ববৎ স্বামি-স্ত্রীভাবে বাস করিতে লাগিল। এই অভয়াও কিরণময়ীর ন্যায় প্রখর বুদ্ধিশালিনী, সে শ্রীকান্তকে এইরূপ বলিতেছে:—

"শ্রীকান্ত বাবু আপনি একটা 'কিন্তু' পর্য্যন্ত বলেই থেমে গেলেন। অর্থাৎ সেখান থেকে আমার চলে আসাটা অন্যায় হয় নি—'কিন্তু'—এই 'কিন্তু' টার অর্থ কি এই যে, যার স্বামী এত বড় অপরাধ করেচে, তার স্ত্রীকে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে সারা-জীবন জীবন্মৃত হ'য়ে থাকাই তার নারীজন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই 'বলিয়ে-নেওয়াটা'ই কি আমার জীবনের একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যে? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছুই না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই, সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ হওয়া চাই? এইজন্যই কি ভগবান্ মেয়ে মানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন?"

এই individual 'versus' societyর দ্বন্দ্ব সংক্ষেপে মীমাংসা করা কঠিন। আর ইহার কোন উপযুক্ত মীমাংসা আছে কিনা তাহাও জানি না। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায়, প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে ঈশ্বরের সৃষ্টিটা এখনও ঠিক চরম পরিণতিতে (perfection) উপস্থিত হয় নাই, এখনও ইহার মধ্যে

সকল বিষয়ে ন্যায়ধর্ম্মের (justice) পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না, এখনও অনেক বিষয়ে অন্যায়, অধর্ম্মের অত্যাচার রহিয়াছে। তাহা যেমন ব্যক্তিবিশেষের জীবনে, তেমন সমাজে—উভয়তই সমান। তবে সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির চরম সুখ ও মঙ্গলের ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও, যাহাতে অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুখ ও মঙ্গল হয়—greatest good of the greatest number—তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছে। "পার্ব্বতী", "সৌদামিনী," "অভয়া"—ইহারা সেই সমাজ-ব্যবস্থার অল্পসংখ্যকের মধ্যে অর্থাৎ exception এর মধ্যে পড়িয়াছে। ইহারা যেন রেলপথে চলিতে চলিতে কোন accident (দুর্ঘটনা) বশতঃ আহত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"গাড়ীতে উঠিয়া আমাদের এই যে দুর্দ্দশা হইল, ইহার জন্য দায়ী সেই রেলগাড়ী, অতএব আর কেহ গাড়ীতে চড়িও না।" ইহাদের দুঃখের আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগের সান্ত্বনা এই যে,—"তোমরা এ জীবনে সুখী হইতে পারিলে না, ইহা তোমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর, মানুষের ভাগ্যবিধাতা একজন আছেন। তোমরা তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর কর। এ জন্মে না হয় পরজন্মে তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের সুখ দিবেন। দুঃখের পর সুখ ও সুখের পর দুঃখ—ইহাই ত জগতের নিয়ম। আর প্রকৃত কথা বলিতে গেলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। পৃথিবীর মহীয়সী রমণীগণ দুঃখাগ্নিতে জীবনাহুতি দিয়াই ত চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।"

অভয়া তাহার পাষণ্ড স্বামীর অত্যাচারে তাহার নারীজন্ম সার্থক

হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছে, কিন্তু যে সকল সমাজে পুরুষ ও নারী পরস্পরকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে, ও অল্প কারণেই যাহাদের সেই বিবাহবন্ধন ছেদন করিবার অধিকার আছে, সেই সকল সমাজেই কি সকল স্ত্রীর নারীজন্ম সার্থক হয়? কত শত রমণীর বিবাহই ঘটিয়া উঠে না। আবার বিবাহ হইলেও স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কলহবিবাদ হইয়া চিরজীবনের জন্য তাহারা পৃথক্ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী George Eliotএর জীবনে আমরা কি দেখিতে পাই? তাঁহার প্রকৃত নাম Mary Ann Evans, ইনি George Henry Lewis নামক একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া, তাঁহার স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার সঙ্গে স্বামি-স্ত্রী-ভাবে একত্র বাস করিতেন। পরে Lewisএর মৃত্যু হইলে তিনি অন্যত্র গমন করেন। একজন সমালোচক George Eliot এর এই জীবন-যাপন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"While it must be said that George Eliot herself always spoke of this relationship as sacred and moral, most writers are agreed that much of the melancholy of her life was due to the difficult situation in which this act placed her."—কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি তাঁহার উপন্যাসে সমাজে প্রচলিত মন্ত্রপড়া বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন? তাহা কখনও নহে। এই সমালোচকই বলিতেছেন,—"In all her best books there seems to be a tendency to insist upon the sanctity of traditional bonds which whatever their origin, are essential

to social welfare. In story after story she attempted to impress on her readers the sacredness of the marriage relations to which her own action had apparently shown her to be indifferent." *

শ্রীকান্তের অভয়া যাহাই বলুক, সেই মন্ত্রপড়া বিবাহ সকল সমাজেই অধিকাংশ নর-নারীর কল্যাণকর বলিয়া চিরদিন স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। এই মন্ত্রিপড়া বিবাহই সুসভ্য সমাজকে অসভ্য ও ইতর-প্রাণী হইতে পৃথক্ করে। ইহাতে যাহার সুখ হয় না,—তাহার নিজেরই দুর্ভাগ্য, নিজেরই কর্ম্মফল বলিতে হইবে। আসল কথা এই, প্রতি মানুষেরই সুখ দুঃখ তাহার নিজ নিজ কর্ম্মের ফল,—আমরা হিন্দুজাতি, আমরা বিশ্বাস করি, প্রতি মানুষের নিজ নিজ কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব (individuality) গঠিত হয়। আমরা এই কর্ম্মবিধানের (Law of Karma) মধ্য দিয়াই মনুষ্যজীবনের সুখ-দুঃখাদি জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করি। তুমি যদি ঈশ্বর না মান,—পরকাল না মান—কর্ম্মফল না মান, তবে তোমাকে ইহা বুঝান শক্ত হইবে।

কোন একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—

"যিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, তিনি সংস্কারবর্জ্জিত হইবেন, কোন বিশিষ্ট সমাজের পক্ষে কোন সত্য হিতকারী কিনা ইহা বিবেচনা না করিয়া তাঁহার অন্তরতম অনুভূতি দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিবেন তাহাকেই তিনি ব্যক্ত করিবেন। কোন বিশিষ্ট সামাজিক আদর্শ

* ("Times of India"—Dec. 1919.)

দিয়া নরনারীর বিচার না করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা সনাতন, যাহা স্বাভাবিক তাহাকেই গভীর সহানুভূতির সহিত তিনি সাহিত্যে আঁকিয়া দিবেন।" *

তিনি আরও বলেন—সাহিত্যের কাজ বিচার করা নয়, শ্রেষ্ঠ artist যিনি তিনি একপ্রকার ঋষিকল্প—জীবনে যাহা কিছু সত্য তাহা তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যক্ত করিবেন। এই জগতের দুইজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক Shakespeare ও Balzac নাকি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আর্টকে নীতিমার্গ অবলম্বন করিতে বাধ্য করিলে আর্টের স্বাভাবিক বিকাশ নষ্ট হইবে, আর্ট পঙ্গু ও কৃত্রিম হইয়া পড়িবে। সুতরাং আর্টকে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দেওয়াই কবির কার্য্য।

এত দিন আমরা কবিকেই নিরঙ্কুশ বলিয়া জানিতাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর্টও যে নিরঙ্কুশ হইবে এরূপ কখনও শুনি নাই। একজন যোদ্ধা অপেক্ষা যদি তাহার তরবারি অধিকতর স্বাধীন হইয়া উঠে, তবে সংসারে অনর্থক মারামারি কাটাকাটির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বেলজাকের গ্রন্থের সহিত আমার ততদূর পরিচয় নাই, কিন্তু জগদ্‌বরেণ্য মহাকবি সেক্ষপীয়ার যে কখনও তাঁহার আর্টকে তাঁহার নিজের উপর প্রভুত্ব করিতে দিয়াছেন এরূপ মনে হয় না। বরং Dowden তাঁহার "Shakespeare's Mind and Art" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

* (শ্রীমহীতোষ কুমার রায় চৌধুরী লিখিত "সাহিত্যে পতিত" প্রবন্ধ—"যমুনা" জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭)।

"To him (Shakespeare) art was not, as it has been to some poets and painters and musicians, a temple worship ; a devotion of self, a surrender which is at once blissful and pathetic to some presence greater and nobler than oneself. Of such pathos we discover none in Shakespear's life. He possessed his art and was not possessed by it."

অতএব আমরা দেখিলাম Shakespeare তাঁহার আর্টের অধীন ছিলেন না, আর্ট তাঁহার অধীন ছিল। সেই আর্টের দ্বারা তিনি কেবল জগতের সত্যসকল অঙ্কিত করিয়া যান নাই, একজন প্রকৃত বিচারকের ন্যায় সমাজের ও জগতের শুভাশুভের বিচারও করিয়াছেন। তাঁহার tragedy গুলিই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার tragedy সম্বন্ধে Dowden বলেন—

"We turn to the great tragedies, and what do we there discover ? In these Shakespeare is engaged in a series of studies not concerning success in the mastery of events and things, but concerning the higher success, and the more awful failure which appear in the exaltation or the ruin of a soul. This with Shakespeare is the true theme of a tragedy."

"In several of the tragedies of Shakespeare the tragic disturbance of character and life is caused by the subjection of the chief person of the Drama

to some dominant passion, essentially antipathetic to his nature, though proceeding from some inherent weakness or imperfection—a passion from which the victim cannot deliver himself and which finally works out his destruction.' e.g. Othello, Macbeth, Hamlet, ইত্যাদি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সেক্ষপীয়ার উল্লিখিত tragedy গুলিতে দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখাইয়াছেন যে, মানুষ কোন একটা চিত্তবৃত্তির অতিমাত্র অধীন হইয়া সংযম হারাইলে তাহার কি দুর্দ্দশা ঘটে। সেক্ষপীয়ার তাঁহার tragedy-গুলিতে পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন।

"Tragedy as conceived by Shakespeare is concerned with the ruin or restoration of the soul, and of the life of men. In other words, its subject is the struggle of good and evil in the world."

কিন্তু এই পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বে তিনি পাপের অতিমাত্র প্রভাব স্বীকার করিয়াও পরিণামে পুণ্যের পবিত্র প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।

"Shakespeare opposes the presence of the influence of evil not by any transcendental denial of evil, but by the presence of human virtue, fidelity and self-sacrificial love." (Page 268)

বেলজ্যাকের ন্যায় Shakespeareও একজন realist ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার realism সৎশিক্ষা-বর্জ্জিত নহে, তিনি আর্টের মধ্য দিয়া প্রকারান্তরে প্রচুর সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাই Dowden বলেন—

"A faithful presentation of the facts of the world does not leave us indifferent to good and evil, but rather rouses within us, more than all maxims and all preachings can, an inextniguishable loyalty to good."

সুতরাং আমরা দেখিলাম ব্যাস-বাল্মীকির কথা ছাড়িয়া দিলেও Shakespeareএর ন্যায় একজন জগৎপূজ্য মহাকবি তাঁহার সমাজের অথবা মানবসমাজের হিতাহিতের দিকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আর্টের সেবা করেন নাই, তিনিও পাপ-পুণ্যের আদর্শ দিয়া নরনারীর বিচার করিয়াছেন; এবং তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর মধ্য দিয়া পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। যাঁহারা সেক্ষপীয়ারকে আধুনিক নিছক বাস্তববাদী (realist) কবিদিগের দলে ফেলিতে চান, তাঁহারা তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন।

সেক্ষপীয়ারের ন্যায় আর একজন জগৎপূজ্য মনীষী রাস্কিন (Ruskin) বলেন—

"High art consists neither in altering nor in improving nature; but in seeking throughout nature whatsoever things are lovely, whatsoever things are pure; in loving these, in displaying to the utmost of the painter's power such loveliness as is in them, and in directing the thought of others to them by winning art or gentle emphasis. Art (*cacteris paribus*) is great in exact proportion to

the love of beauty shown by the painter, provided that love of beauty forfeits no atom of truth."

*   *   *   *

"Art is unquestionably one of the purest and highest elements in human happiness. It trains the mind through the eyes, and the eye through the mind. As the sun colours flowers, so does art colour life."

রাস্কিন এখানে চিত্রকলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, কিন্তু কাব্যের আর্ট সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম। স্বভাবের মধ্যে যাহা সুন্দর ও যাহা পবিত্র, চিত্রকর ও কবি তাহাই অঙ্কিত করিবেন, এবং তদ্দ্বারা মানবজীবনের উচ্চতম ও পবিত্র সুখবিধান করিবেন।

Lord Avery তাঁহার "Pleasures of Life" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"It has been said, on high authority, that the end of all art is to please. But this is a very imperfect definition. It might as well be said that a library is only intended for pleasure and ornament."

"The true, the good, and the beautiful" says Cousin "are but forms of the infinite ; what then do we really love in truth, beauty, and virtue ?

We love the infinite himself. The love of the infinite substance is hidden under the love of its forms. It is so truly infinite which charms in the true, the good, and the beautiful, that its manifestations alone do not suffice. The artist is dissatisfied at the sight even of his greatest works; he aspires still higher."

* * * *

"The highest service, however, that art can accomplish for man is to become "at once the voice of his nobler aspirations, and the steady disciplinarian of his emotions; and it is with this mission, rather than with aesthetic perfection, that we are at present concerned" (Hawais).

উল্লিখিত মনীষীগণের মতে আর্টের উদ্দেশ্য কত মহান্ ও কত পবিত্র! আর্ট যদি কেবল আমাদের মনোরঞ্জন করিত, তবে পুস্তকসমষ্টিও কেবল গৃহসজ্জার উপকরণ বলিয়া গণ্য হইত। আর্ট সত্য-সুন্দর-মঙ্গলকে চিনাইয়া দেয়—কারণ, সেই সত্য-সুন্দর-মঙ্গল এক অখণ্ড অদ্বিতীয় পরম সত্তার বহিঃপ্রকাশ। আর্ট মানবহৃদয়ে উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা সকল জাগাইয়া তোলে, এবং তাহাকে চিত্তশুদ্ধির দিকে লইয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন আর্টের উদ্দেশ্য নহে।

(১৩)

শেষের কথা।

এখন কথা হইতেছে, বাঙ্গলা উপন্যাসে যদি বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম, বারবনিতার প্রেম না আসিল—এক কথায় যদি সকল রকমের প্রেমচিত্রই বাঙ্গলাসাহিত্য হইতে বর্জ্জন করা হয়,—তবে বাঙ্গলার কবিগণ কোন্ উপাদান লইয়া কাব্য রচনা করিবেন? তাঁহারা কি কেবল Moral text book রচনা করিবেন?

না—আমি তাঁহাদিগকে কেবল হিতোপদেশ রচনা করিতে বলি না। তাঁহারা বাঙ্গালীজীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীকে মনুষ্যত্ব লাভের পথ দেখাইবেন। বাঙ্গালীজীবনের সুখ-দুঃখ, আমোদ-আহ্লাদ, অভাব-দৈন্য, অত্যাচার-অবিচার, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ-প্রীতি প্রভৃতি তাঁহাদের কাব্যের বিষয় হইবে। বাঙ্গালীজীবনের সাধনা কি, সিদ্ধির পথ কি, সিদ্ধি কতদূরে, ইহা তাঁহারা দেখাইবেন। বাঙ্গালীজীবনের যাহা সত্য বস্তু—তাহাই তাঁহারা বাঙ্গালীর মঙ্গলের জন্য সুন্দর করিয়া দেখাইবেন। ইংরেজী love জিনিষটা, যাহাকে আমরা প্রেম নাম দিয়া তরজমা করিয়া থাকি, তাহা বাঙ্গালীজীবনে সত্য নহে, উহা বাঙ্গালীর সমাজে ছিল না, এবং এখনও ইঙ্গ-বঙ্গসমাজ ভিন্ন বাঙ্গালীসমাজে নাই। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা বা স্নেহ, তাহা স্বতন্ত্র জিনিষ, তাহা এই love নহে। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বিবাহের পূর্ব্বে জন্মে না, বিবাহের দ্বারা তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু

love বা প্রেম বিবাহের পূর্ব্বেও জন্মে। Love এর মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলে, ভালবাসা যেন স্তিমিতপ্রবাহা নদী, তাহা একবার জন্মিলে আর তাহার তেমন হ্রাস বৃদ্ধি নাই। Love সর্ব্বগ্রাসী—তাহা স্ত্রী বা পুরুষের হৃদয়কে "খাসদখল" করিয়া বসে, সে হৃদয়ে মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনীর স্থান আর তেমন থাকে না—যাঁহারা এই প্রেমে পড়েন, অন্ততঃ তাঁহাদের সংসারে মাতাপিতা ভ্রাতাভগ্নীদিগের স্থান হয় না। কিন্তু ভালবাসা স্ত্রী বা পুরুষের হৃদয়কে এরূপ একচেটিয়া করিয়া রাখে না। পাশ্চাত্য সমাজের প্রেমের সহিত আমাদের সমাজের স্নেহ বা ভালবাসার ইহাই মোটা-মুটি প্রভেদ। আবার পাশ্চাত্য সমাজে আমাদের ন্যায় স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা থাকিলেও, love নাও থাকিতে পারে। যাঁহারা Marie Correli প্রণীত "Sorrows of Satan" এবং Mrs. Henry Wood প্রণীত East Lynne উপন্যাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমার কথার তাৎপর্য্য সহজে বুঝিবেন। ইহাঁরা দেখাইয়াছেন—"পাশ্চাত্য সমাজে প্রেমকে অতিমাত্র স্বাধীনতা দিতে দিতে এখন তাহার পাখা হইয়াছে, সে এখন সুদূর সূক্ষ্মতম আকাশে ethereal regionএ উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সে এখন সাধারণ ঘরকন্না-রূপ খুঁটিনাটির মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া নিজেকে ধূলিমলিন করিতে একান্তই অনিচ্ছুক। পাশ্চাত্যসমাজে স্বামী এখন স্ত্রীর নিকট হইতে আদর অনুরাগ স্নেহ সবই পাইতেছেন, কেবল পা'ন না সেই অদ্ভুত রহস্যময় বস্তুটি অর্থাৎ love বা প্রেম। স্ত্রীর নিকট হইতে সেই সূক্ষ্মতম পদার্থটি লাভ করা কদাচিৎ

কাহারও ভাগ্যে ঘটে। কারণ love বড় ethereal আকাশ-শরীরী, তাহা কাহাকেও ধরাছোঁয়া দেয় না—তাহা নর-নারীর ইচ্ছাধীন নহে, তাহা নর-নারীর ইচ্ছাশক্তির অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।—"It is a capricious passion and generally comes without the knowledge against the will"— *। আমাদের উপন্যাসলেখকগণ আর্টের সাহায্যে এই বিলাতী প্রেমকে আমাদের সমাজে আমদানি করিতেছেন। বিলাতী আলু, বিলাতী বেগুণ প্রভৃতির ন্যায় এই বিলাতী প্রেমেরও চাষ এখন আমাদের সমাজে তাঁহারা চালাইতে চান। চোখের বালির "বিনোদিনী", বড় দিদির "মাধবী," পল্লীসমাজের "রমা", নষ্ট-নীড়ের "চারুলতা," ঘরে বাইরের "বিমলা," চরিত্রহীনের "কিরণময়ী," দেবদাসের "পার্ব্বতী", স্বামীর "সৌদামিনী" ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের সমাজে প্রচলিত স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসার একটা ব্যভিচারী ভাব ছিল এবং এখনও আছে, যাহাকে ইতর ভাষায় বলে "পিরীত"। ইহা চির-দিনই ঘৃণার্হ বস্তু ছিল এবং এক বৈষ্ণব সাহিত্য ভিন্ন ইহা কখনও সৎসাহিত্যে মাথা তুলিতে পারে নাই। আমাদের উপন্যাস-লেখকগণ ইহাকেও প্রেম নাম দিয়া ভদ্রবেশে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্তও সেই "কিরণময়ী" আর দেবদাসের "চন্দ্রমুখী," শ্রীকান্তের "রাজলক্ষ্মী" ও "অভয়া"। আমার বিশ্বাস, এই সকল বিলাতী প্রেম ও ব্যভিচারী প্রেমের

---

* মৎ-প্রণীত "তপস্যা"—৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমদানি না করিলেও বাঙ্গালীজীবনের সুখদুঃখময় কাব্যকাহিনী রচিত হইতে পারে।

১৩২৬ সনের পৌষ মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় "বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতা" নামক একটি প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের পক্ষে ওকালতী করিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন। বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য তিনি যাহা বলেন, তাহা সরল ভাষায় ব্যক্ত করিলে আমি উপরে যাহা লিখিয়াছি মোটের উপর তাহাই দাঁড়ায়। তিনি বলেন, বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমাজের ও সমাজব্যাপী সভ্যতার যথাযথ চিত্রাঙ্কন—আমাদের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল সমাজে কোন্ আদর্শ কি ভাবে কার্য্য করিতেছে, বর্ত্তমান যুগের কাঞ্চন সভ্যতার অপ্রতিহত প্রভাবে আমাদের পুণ্যময় প্রাচীন আদর্শগুলি কি প্রকারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আপাতমধুর দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দতাকে খুব বড় করিয়া ধরিলে মানবচিত্ত সংযম হারাইয়া কি প্রকারে বাসনাবহ্নিতে আত্মসমর্পণ করিয়া ভস্মসাৎ হয় ইত্যাদি প্রদর্শন করা। বস্তুতন্ত্র সাহিত্য কাব্যচিত্রের মধ্য দিয়া এই সকল প্রদর্শন করিয়া আমাদের জরাজীর্ণ অথচ মোহগ্রস্ত সমাজকে সুখ ও শান্তির দিকে লইয়া যাইতে চায়। বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের যদি এই প্রকার উদ্দেশ্য হয়, তবে সে ত খুব ভাল কথা। কিন্তু একথা বলিয়া, লেখক আরও বলেন,—

"বাস্তব সাহিত্যে মর্ত্ত্যবাসী নরনারীর প্রতিদিবসের স্থূলতার বাহুল্য থাকিলেও, ইহাতে সত্যশিবসুন্দরের নির্ম্মল চিত্র না

থাকিলেও ইহা সত্যের সমষ্টি এবং ইহাতে উপভোগের দ্রব্যসামগ্রী যথেষ্ট আছে। যিনি যাহাই বলুন কুরুচি বা কুনীতির প্রশ্রয় ইহার উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্যের এই অঙ্গের একমাত্র উদ্দেশ্য পার্থিবতার দিক্ হইতে কাব্যসৌন্দর্য্যের সাহায্যে উচ্চ মানবিকতার উদ্দীপনা এবং সহজ ও সরল ভাবে মানবজীবনের একটা সুশৃঙ্খল মীমাংসা করা। প্রত্যক্ষবোধ্য ইন্দ্রিয়সেব্য বস্তু ইহার শেষ কথা নহে।”

আমি এ স্থলে লেখকের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। যাহারা “Art for art's sake”—এই কাব্যনীতি প্রচার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উচ্চ মানবিকতার উদ্দীপনার জন্য অথবা মানবজীবনের একটা সুশৃঙ্খল মীমাংসার অভিপ্রায়ে বস্তুতন্ত্র কাব্য রচনা করেন না। তাঁহারা কাব্যকে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর ন্যায় একটা ভোগ্য বস্তু-ভাবেই দেখেন, এবং সেই ইন্দ্রিয়ভোগ চরিতার্থ করিবার জন্যই কাব্য রচনা করেন। কুরুচি বা কুনীতির প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় না থাকিলেও ফলে তাহাই দাঁড়ায়, ইহা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার কাব্যসমালোচনাতে দেখাইয়াছি। আর বস্তুতন্ত্র কাব্য যে “সত্যের সমষ্টি” লইয়া রচিত হয়, ইহাও আমি স্বীকার করি না। সমাজে যে love বা প্রেম নাই, যাহা বিলাত হইতে আমদানি, বস্তুতন্ত্র কাব্য তাহারই কৃষিক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের প্রলোভনময় মাদকতা হইতে পাঠক-পাঠিকাগণের আত্মরক্ষা করা কঠিন, একথা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—“কিন্তু একথা ঠিক যে, মানুষ যতদিন পৃথিবীর মানুষ, নামের ভিখারী, স্বার্থের

পূজারী, কামনার দাস, সৌন্দর্য্যের উপাসক থাকিবে, মানুষ যতদিন না পূর্ণ দেবত্ব পায়, ততদিন মানুষ বিহ্বল সৌন্দর্য্যের প্রবল মাদকতার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।" অথচ লেখক মানুষের এই প্রবল ইন্দ্রিয়বিহ্বলতা দূর করিবার একমাত্র ঔষধ বস্তুতন্ত্র সাহিত্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বলেন— ইন্দ্রিয়াসক্ত "natural man" কে সদুপদেশ দিলে কোন উপকার হইবে না; তাহাকে কেন্দ্রচ্যুত উল্কার মত তাহার নিজের পছন্দসই ধর্ম্মহীন অশিবের পশ্চাতে চলিতে দাও, যোড়শোপচারে ভোগ-বিলাসের সেবা করিতে করিতে তাহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অন্ধকারে আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিবে অর্থাৎ তাহার মোহ কাটিয়া যাইবে।

লেখকের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা রোগের এই চিকিৎসাটাকে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা বলা যাইতে পারে "similia similibus curantur" অর্থাৎ "সমঃ সমং শাময়তি "অথবা বিষস্য বিষমৌষধম্"। যাহার অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়লালসা আছে, তাহাকে আরও অধিক ভোগের বস্তু যোগাও—সে ভোগ করিতে করিতে আপনিই শান্ত হইয়া পড়িবে—তাহার মোহ কাটিয়া যাইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কোন কোন স্থলে সুফল ফলিতে পারে। কিন্তু ইহা এতদূর বিপজ্জনক যে অধিকাংশ স্থলেই ইহা প্রযুজ্য নহে। অবশ্য একটা দুষ্ট ঘোড়াকে ক্রমাগত ছুটাইতে ছুটাইতে সে অবশেষে হয়রান হইয়া পথে আসে, কিন্তু মানুষ যখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে করিতে পথে আসে, তখন তাহার জীবনের কোন পদার্থই থাকে না। এই বীরাচারী চিকিৎসার চেয়ে বরং বেদাচারী ব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রদ

বলিয়া মনে হয়। প্রথম হইতে মানুষকে সদাচার ও সংযম শিক্ষা দিলে তাহার ইন্দ্রিয়পিপাসা বাড়িতেই পারে না। আমাদের ঋষিগণ বলিয়াছেন,—

"নজাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

কামী ব্যক্তির ভোগলালসা উপভোগের দ্বারা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এইজন্য তাঁহারা নানাপ্রকার সদাচার ও সংযমের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লেখক আরও বলেন—"যাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, আধ্যাত্মিকতা-বিরহিত ধর্ম্মসম্পদ-শূন্য অথচ অপূর্ব্ব মধুরতাময় বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের বহুল প্রচারের সহিত আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশের পাপ তাপ আসিয়া পড়িবে, লালসা ও চাঞ্চল্যের বেগ ও ব্যভিচার বাড়িয়া উঠিবে, তাঁহাদের সেই আকুল আশঙ্কা ভিত্তিহীন ও একান্তই কাল্পনিক বলিয়া আমার মনে হয়। আমরা স্থিতিশীল প্রাচীন জাতি। আমাদের শান্তিপ্রিয় অচঞ্চল গতিহীন সমাজ বেশ আঘাতসহ, আমাদের পরিপুষ্ট ধর্ম্মসংস্কার আজও অক্ষুণ্ণ এবং ভাঙ্গন সামলাইতে বেশ নিপুণ। আমরা সাংসারিক বিকল্পতায় বিচলিত নহি। ব্যাস, বাল্মীকি, মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের পুণ্যস্মৃতি যতদিন আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে, ততদিন আমাদের কর্ম্মধারা, আমাদের জীবন-যাত্রার প্রথা-পদ্ধতি, আমাদের সমাজ সদাচার অনেকটা নিরাপদ।"

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেকে আমাদের সমাজের যে জড়তাকে নিন্দার বিষয় মনে করেন, লেখক তাহাকেই প্রশংসার বস্তু মনে

করিতেছেন। আমি কিন্তু আমাদের সমাজকে ততদূর গতিহীন বলিয়া মনে করি না এবং আমি এই লেখকের ন্যায় ততদূর optimistic-ও নহি। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের স্থিতিশীল সমাজে অনেক দিন হইতে "ভাঙ্গন ধরিয়াছে," সমাজের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, সেই প্রবল স্রোতের মুখে ব্যাস, বাল্মীকি, যাজ্ঞবল্ক্যের পুণ্যস্মৃতি কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, পাশ্চাত্য সমাজের লালসা-পিপাসা উদ্দীপ্ত হইয়া—হিন্দুজাতির মজ্জাগত সংযমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীশ্বর শিক্ষা-পদ্ধতি (godless education) নব্য যুবকদিগকে কেন্দ্রভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। ইহার পরে বাস্তব নাম-ধারী কামকলুষময় সাহিত্য যদি আর্টের পুষ্টির জন্য লালসার ইন্ধন যোগাইতে আরম্ভ করে, তবে সমাজকে কিসে রক্ষা করিবে? কেহ কেহ হয়ত ইহাকেই আমাদের সমাজের উন্নতি মনে করেন। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, বাঙ্গালী সমাজের একটা বিশিষ্টতা আছে, একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে, একটা বিশেষ সাধনা আছে। কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়া ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করা বাঙ্গালীর জীবনের চরম লক্ষ্য নহে। মানুষকে সদাচার, সংযম, তিতিক্ষার মধ্য দিয়া ঈশ্বরাভিমুখী করা, ইহাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের দেশের ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া লোকশিক্ষার্থে কাব্য রচনা করিয়াছেন। আমাদেরও সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সমাজের হিতার্থে, মানবজীবনের

সফলতার জন্য কাব্যরচনা করা উচিত। যে সকল কবি ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বিজাতীয় আদর্শে কাব্য রচনা করিয়া সমাজে নরনারীর মধ্যে বিসদৃশ প্রেমলালসা জাগাইয়া সতী নারীকে উদ্‌ভ্রান্ত ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্যব্রতের ব্যাঘাত করিতেছেন, তাঁহারা কতদূর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, একবার তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত। সমাজ ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু আর একটা সমাজ গড়া বড়ই কঠিন। যে প্রবল পদ্মানদী এক পাড় ভাঙ্গিতেছে, সে আবার অন্য পাড় গড়িতেছে। যাহাদের গড়িবার সাধ্য নাই, তাহারা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে কেন? আবার সেই নদীও এক পাড়ের যে সৌধ-মন্দির-শোভিত নগর ভাঙ্গিতেছে, অপর পাড়ে কি তাহাই গড়িতে পারে? কখনই না—সে যাহা গড়ে, তাহা কেবল বৃক্ষলতাশূন্য প্রান্তর—মরীচিকাময় মরুভূমির ন্যায় তাহা ধূ ধূ করিতেছে। যাঁহারা আমাদের এই সংযম-শাসিত প্রাচীন সমাজ কাব্যকলার সাহায্যে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের এই কথা স্মরণ রাখা উচিত। অশেষ দুঃখদৈন্যপ্রপীড়িত বাঙ্গালীর জীবনে বাহিরের শত লাঞ্ছনার মধ্যে গৃহই একমাত্র জুড়াইবার স্থান। ভগবান্ আমাদিগকে সেই গৃহের সুখ-শান্তি-পবিত্রতা রক্ষার সুবুদ্ধি প্রদান করুন।